KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol & Number : 45/1 45/2 45/3 45/5	Year of Publication May 1984 Jun 1984 July 1984 Sep 1984
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

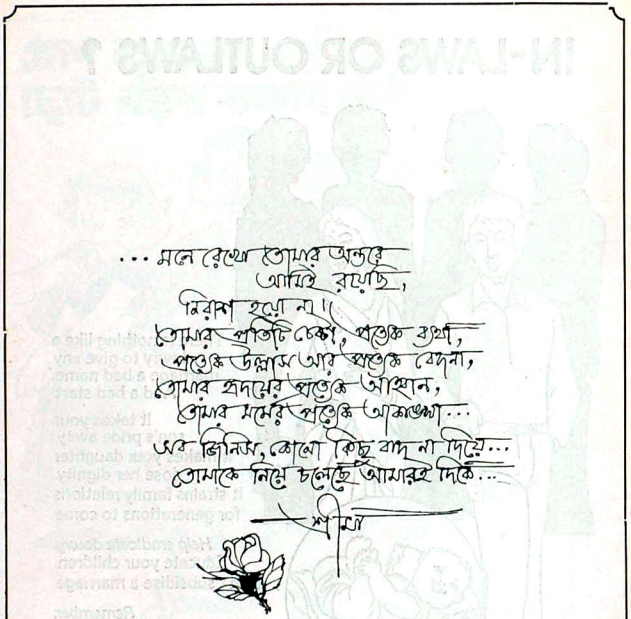

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ৫
সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯১

'ফাল্গুনী' : শিল্পীর স্বগতভাষণ ভূদেব চৌধুরী ৩৯১
কাবিননামহ্ বনাম বসুধারা : অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে গৌরী আইয়ুব ৪১২

তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক শামসুর রাহমান ৩৮৯
মহাজীবনের স্বপ্ন রামেন্দ্র দেশমুখ্য ৪০৮
কৈশোরের ঘরবাড়ি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪১০
নজরুল-সংগীত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৪১১

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৪০১
সংকট-বিহার শওকত ওসমান ৪২৩
গুরুজীর সঙ্গে চীনে শ্যামাদাস চক্রবর্তী ৪৩০
শহর সংস্করণ শংকর বসু ৪৩৫
জাহাজী গল্প অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৪৪০

গ্রন্থসমালোচনা ৪৪৩
অমলেন্দু বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, দেবীপদ ভট্টাচার্য, ভবানী ভট্টাচার্য, আবদুর রউফ

আলোচনা ৪৫২
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ্বর মিত্র, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

হাসিত ১৯৭৯

প্রচ্ছদচিত্র। ইন্দ্র দুগার

রেখাচিত্র। প্রকাশ কর্মকার

শিল্পপরিকল্পনা রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Wishing
Chaturanga
a bright
future

A well-wisher

তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক

শামসুর রাহমান

কেন তুমি আজ এভাবে তাকাও আমার দিকে?
তোমার দৃষ্টি মুক্তি পেল কি ঝোড়ো আকাশে?
পাঁচ দশকের সত্তা আমার বাত্যাহত,
দুজনের মাঝে প্রলয়াকাঙ্ক্ষী পিশাচ হাসে।

এরকম জানি প্রায়শই ঘটে, সিঁড়ির ধাপ
বেয়ে উঠি আমি, তুমি নেমে যাও তরতরিয়ে।
সংলাপহীন কাটে কত কাল, আমরা যেন
দু মেরুর প্রাণী। কারা বিষধোঁয়া দেয় ছড়িয়ে?

কেউ কারো মুখ দেখি না আমরা অনেক দিন ;
হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে গেলে চমকে উঠি।
অপরিচয়ের ছায়া ঝুঁকে থাকে চোখের কোণে,
তোমার শিরায় স্পন্দিত হয় মোরগঝুঁটি।

তুমি অবিরত পাতালে নামছ ; রাতদুপুরে
তোমাকে মাতায় সাইকেডেলিক চিত্রাবলি ;
পারি না ফেরাতে তোমাকে কখনও ভূতল থেকে ;
তুমি ক্ষয়ে যাও, আমি নিজস্ব নরকে জ্বলি।

যে-কোনো সময় তোমাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে
হৃদয় আমার শ্মশানভস্মে যাচ্ছে ঢেকে।
তখন তোমাকে খুঁজব কোথায় কোন্ নিবাসে?
কোন্ সে পাতালে বয়ে যাবে বেলা তোমাকে ডেকে?

বহু যুগ ধরে আমার ভেতরে যে কালকূট
সঞ্চিত তার নির্যাস বুঝি তোমার শিরা
করেছে ধারণ। আমি অসহায় তাকিয়ে থাকি,
তোমাকে ক্রমশ করছে দখল করাল পাঁড়া।

তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক

চুম্বনে তুমি পাও না শান্তি নব্য যুবা।
যৌবনে ঘুন ধরেছে আগেই, আশা উধাও,
বিপুল না-এর ক্রুর বীভৎসে বন্দী হয়ে
মরীচিকাময় শূন্যের প্রতি হাত বাড়াও।

নেতিবাদে হলে প্রতিবাদী সুর মঞ্জরিত,
মৃতের মুখেও ফুটবে গোলাপ, বাজবে শাঁখ।
এই ডামাডোলে চাই আমি চাই তোমারই জয়,
আমার ধ্বংসে তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক।

'ফাল্গুনী' : শিল্পীর স্বগতভাষণ

ভূদেব চৌধুরী

"প্রকাশই কবিত্ব"—অল্প বয়স হতে এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ছিল।[১] তাহলেও প্রকাশের সমস্যাই একবার অন্তত তাঁকে ভারি ভাবিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সঠিক সমাধানও হয় নি কিছু ; তবু কেবল মন-মাতানোর অনন্য আবেদনেই উপস্থাপনা সফল হয়েছিল। 'ফাল্গুনী' সেই রহস্যামোদিত সৃষ্টি।

রবীন্দ্র-রচনায় দুর্বোধ্যতার অনুযোগ নূতন নয়। তাহলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকাশের দায়িত্ব নিছক বুঝিয়ে বলারও নয় কখনোই, প্রতীতিসাধনের ; শিল্পীর অন্তশ্চেতনার দোলায় পাঠক-দর্শক, তথা রসাগ্রহী-মাত্রকেই অনুভাবিত—উদ্দীপিত করে তোলার! আর কাব্য-সাহিত্য বাগর্থ-নির্ভর শিল্প বলেই বাগ্‌বিন্যাসের পরম্পরাবশে প্রতীতির সংবাহন সাধিত হতে পায় শিল্পী থেকে রসবেত্তার চেতনা অবধি। অর্থ-যে একটা স্পষ্ট বুঝতে-বোঝাতে হবেই, এমন নয়। একদা-বিতর্কিত 'সোনার তরী' কবিতায় সব কথা জড়িয়ে বক্তব্যের স্পষ্টার্থ একটা গড়ে ওঠেই, এ-দাবি করা কঠিন। অথচ কথার পিঠে ধ্বনি-স্পন্দিত ছবির পরম্পরানুষায়ী যোজনা চোখ-কান-মনকে মাতিয়ে তোলে, আর তারই ফলে সুনিশ্চিত প্রতীতির আন্দোলনে দুলে ওঠে চেতনা। অতএব সাহিত্যে সুষ্ঠু প্রকাশের প্রধান প্রয়োজন পরম্পরিত বাণীর সংযোজনে চেতনাকে সুনির্দিষ্ট ভাবনা-ধারায় হিল্লোলিত করে তোলা।

অন্তশ্চেতনামন্থনের আরো একটা মাত্রা আছে ; সে ব্যক্তিগত—নির্বাক। যথার্থ স্রষ্টার পক্ষে আবার ঐটিই প্রকাশ-উন্বেজনারও উৎস। সুনিশ্চিত প্রতীতির বশে নিজে উদ্দীপ্ত হতে পারলে তবেই তো উদ্দীপিত করার প্রশ্ন। তার প্রকরণটি আসলে নিজের মধ্যে নিজে হয়ে ওঠার, কিংবা নিজেকে খুঁজে পাবার। আর এ-অভিজ্ঞতায় কবি-শিল্পীর অধিকারই একমাত্র নয়, মনে মনে ভাবনার দোলায় আন্দোলিত হয়ে ফেরা যে-কোনো ব্যক্তিরই সাধারণ প্রবণতা ; হাসিকান্না, ভালোমন্দ লাগার মতো এ-সবই ব্যক্তির অন্তশ্চেতনামন্থনের ফসল —নিরন্তর বহমান অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে অন্তরে অন্তরে যার বিচিত্র প্রসার! নিজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উপচীয়মান এইসব ভাব-ভাবনা-ঘটনার পরম্পরা নেই কোনো ; অথচ সব মিলিয়ে, সকল ওঠা-পড়ার অভিঘাতে সঞ্চরণশীল প্রতীতির রূপরেখা আভাসিত হয়েই চলে

মনে-মনে। অনেক সময়েই তা অতটাই গাঢ় হতে পায় না, যার চাপে প্রকাশের তাগাদা ভেতর হতে ঠেলে উঠতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রতীতির প্রেরণা কেবল নিজেকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা ; ছোটোবেলায় শুনতাম, 'মনে মনে মনকথা বলা'—তাকেই বলি স্বগতভাষণ! সবাই মিলে তাই করি আমরা জেনে-না-জেনে ; রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় কত করেছেন আরো সব স্রষ্টা-শিল্পীর মতো—সকল সহজ মানুষের মতো।

অতএব প্রতীতির দুই মাত্রা ; একটি সর্বমানবিক —আত্মম্ভর এবং নীরব-নিভৃত ; অপরটি তদভিপ্রায়ী, 'প্রকাশ'-উন্মুখ—স্রষ্টার সাধন-ধন। 'ফাল্গুনী'র বেলায় মাত্রাছুট আরো এক মাত্রার উদ্ভব কী ঘটেছিল শিল্পীর মনে,—যা নিয়ে তার 'প্রকাশে'র সমস্যা?

'মনকথা' বলি আমরা মনে-মনে, নিঃশব্দে। কিন্তু কখনো, খুবই কদাচিৎ হলেও, অতটাই ঘনগভীর চাপ যদি জমে অস্তিত্বের মূল অবধি আলোড়িত করে—মনের নীরব কথা মুখের ভাষায় আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে ওঠে যখন! 'ম্যাকবেথ' নাটকে ম্যাকবেথ-এর অবিস্মরণীয় স্বগতোক্তির সেই ফোয়ারা :—তার সবটুকুই নাটকের বোধগম্যতার দাবিতে নিছক কবি-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া কি চলে?—অর্থাৎ নাটকীয় প্রয়োজনের চাহিদাকে পুরো মেনে নিয়েও অমন অমেয় মনোমন্থনের মানবিক সম্ভাবনাকেও এড়িয়ে যাবার উপায় কই বাস্তব জীবনেও —নিভৃত আত্মার আবর্তন যখন সরব স্বগতসম্ভাষণের আগল খুলে দেয় চেতনার গভীরে! 'ফাল্গুনী'তে, মনে হয়, তাই ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ; অনেক দিনের পুঞ্জিত আন্তর উদ্বেজনার ঠেলে-ওঠা জোরে মনের আলোড়ন লেখার কথায় রূপ ধরেছিল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিপরীত সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন কবির জবানি ধরে :—"আশ্রমের ছেলে-বুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত-উৎসবের উপযোগী একটা ছোটো নাটক রচনা করে দিতে হবে।" শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে, 'বসন্তোৎসব' নামে সে রচনাটি শেষ হয়ে যায় ৪ মার্চ, এবং পরদিন তা আশ্রমে পড়ে শোনানোও হয়েছিল।[৩] তাহলেও সে-নাটক 'ফাল্গুনী' নয় কিছুতেই, তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। পাণ্ডুলিপিতে[৪] দেখা যায়, প্রথমে অনতিদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখে[৫] তার তলায় 'সুরুল, ২০ ফাল্গুন, ১৩১২' মুদ্রাঙ্কিত করে তার পরে 'ফাল্গুনী' নাটক লিখতে আরম্ভ করেন কবি। ঐদিন ছিল ৪ মার্চ, ১৯১৫, বৃহস্পতিবার।[৬] কিন্তু সে রচনা শেষ হয় নি ওইদিন ; চলেছিল পরবর্তী কয়েকদিন ধরে। দ্বিতীয় আরো যে-একটি পাণ্ডুলিপিতে[৭] 'ফাল্গুনী'র গান-এর প্রথম রচনারূপ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, চতুর্থ দৃশ্যে বাউলের কণ্ঠের 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' গানটি রচিত হয়েছিল ২১ ফাল্গুন সুরুলেই,[৮] এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে নবযৌবনের দলের গান "চলি গো চলি গো যাই গো চলে" রচনার স্থানকাল 'রেলপথে ২৩ ফাল্গুন'।[৯] আর 'ফাল্গুনী'র পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, ঐ গান-দুটি নাটক রচনার প্রবহমান ধারায় স্বাভাবিকভাবেই যথাস্থানে বিন্যস্ত হয়েছে[১০] ; এগুলো মূল রচনার পৃষ্ঠায় পরবর্তী আরোপণ নয়। অতএব 'ফাল্গুনী' লিখে শেষ করতে ২৩ ফাল্গুন পেরিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়।

তাহলে 'বসন্তোৎসব' কি 'বসন্তের পালা'র পূর্ব-রূপ? হতেও পারে, না-ও পারে। কিন্তু এমন কি মূলত ফরমায়েশের ফসল যদি হয়ও, তবু অন্তঃস্বভাবে 'ফাল্গুনী' যে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার তাগিদে ভেতর হতে ঠেলে-ওঠা কথাই, স্রষ্টার নিভৃত প্রতীতির সঙ্গে সর্বজনীন প্রতীতির যোগসাধনের আয়োজন যে তার গভীরে যথোচিত ছিল না, তার প্রমাণ রয়েছে এই নাট্যরূপে কবিকৃত পৌনঃপুনিক রূপবদলের ইতিহাসে।

পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, ১৩২১-এর ২০ ফাল্গুনে সূচিত 'ফাল্গুনী' নাটক যখনই সমাপ্ত হোক, তার মধ্যে প্রচলিত 'ফাল্গুনী' গ্রন্থের 'সূচনা' কিংবা চার দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা' চারটি একেবারেই ছিল না। ১৩২১ বাঙলারই চৈত্র-সংখ্যা 'সবুজপত্র'তে 'ফাল্গুনী'র পাণ্ডুলিপিধৃত ওই নাট্যাংশটুকু ভূমিকাসহ মুদ্রিত হয়। কিন্তু তার আগে ছিল ১৪-পৃষ্ঠা-জোড়া একটানা গানের একটি রূপক-মালা—'বসন্তের পালা' ; তারও প্রারম্ভে 'ভূমিকা' ছিল একটি। বিষয় কিংবা ভাবের দিক থেকে 'ফাল্গুনী'র সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগই নেই 'বসন্তের পালা'র ; পরবর্তী কালে সেই যোগাযোগটা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে 'ফাল্গুনী'র প্রথম গ্রন্থিত রূপে 'বসন্তের পালা'র গানগুলিকে বিভিন্ন দৃশ্যের 'গীতিভূমিকা'রূপে পুনর্বিন্যস্ত করে : সেই বিন্যাসই শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। সে যেমনই হোক, 'সবুজপত্র'তে প্রকাশিত 'ভূমিকা'-তে কবি বলেছিলেন, "আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক 'ফাল্গুনী' বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই 'বসন্তের পালা'র গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়ালনাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইবে।"[১১]

এখানে 'নাটকের ধরনের ব্যাপার', 'খেয়ালনাটক' অভিধা দুটি 'ফাল্গুনী'র নাট্যাংশ সম্পর্কেই কেবল প্রযোজিত ; রচনাটির অন্তর্নিহিত আঙ্গিক শিথিলতা যেমন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তার 'প্রকাশ'গত অস্বচ্ছতা নিরসনের প্রয়োজনে 'বসন্তের পালা'র সংযোজন! কিন্তু লক্ষ করে দেখি, 'ফাল্গুনী' নাটক যখন প্রথম প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন 'সবুজপত্র'তে, তখনো এরূপ কোনো প্রযোজনবোধ কবির মনেই ধরে নি মোটে। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রথমাবধি পৃষ্ঠা-সংখ্যা ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়ে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। তাতে দেখি, ফাল্গুন সংখ্যার শেষ হয়েছে ৮০৫ পৃষ্ঠায় ; চৈত্র সংখ্যার নামপৃষ্ঠা ৮০৬, ৮০৭ থেকে শুরু হয়েছে 'ফাল্গুনী' নাট্যাংশের 'ভূমিকা' ; তারপরে ক্রমান্বয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে চলেছে নাটকের সম্পূর্ণ মুদ্রণ। অথচ তা সত্ত্বেও ৮০৬ পৃষ্ঠার পরেই কিন্তু ৮০৭ পৃষ্ঠা বিন্যস্ত হয় নি ; তার বদলে আছে পৃষ্ঠাঙ্ক 'অ' ; এবং তারপরে 'ঔ' পর্যন্ত ১৪ পৃষ্ঠায় [তার মধ্যে 'ঋ-ঋ' এবং '৯-৯'-ও ব্যবহৃত হয়েছে] 'ভূমিকা'সহ মুদ্রিত হয়েছে 'বসন্তের পালা'। স্পষ্টই বুঝি, আগে 'ফাল্গুনী' পুরো ছাপা হয়ে গিয়েছিল অপরতন্ত্রভাবে 'সবুজপত্র'র জন্য—পরে দ্বিতীয় চিন্তায় তার মুখবন্ধরূপে 'বসন্তের পালা'র সংযোজন প্রয়োজন বোধ হয়েছিল। এবারে যদি বলি, আপন হৃদয়-মন্থনের শেষে 'ফাল্গুনী'র লিখিত রূপ দেখে কবি আত্মমগ্ন আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন ; ছাপতেও দিয়েছিলেন লেখাটিকে যথারীতি ; কিন্তু পাঠকের ভূমিকায় বসে ওই মুদ্রিত রূপ আবার পড়লেন যখন, তখনই স্রষ্টার মনে ধরল অপূর্ণ 'প্রকাশ'-এর বেদনা!

তখনই এল 'বসন্তের পালা'র চাহিদা। পাঠক-দর্শকের তরফে তাতেও স্পষ্ট প্রতীতি যে বিহিত হল না, সে তো কবিও বুঝেছিলেন, 'বসন্তের পালা'কে যখন দৃশ্যে দৃশ্যে বিচ্ছিন্ন করে চারটি গীতিভূমিকা প্রস্তুত করলেন! অখণ্ড 'বসন্তের পালা' আগে থেকেই রচিত হয়েছিল, না 'ফাল্গুনী'র মুদ্রিত নাট্যাংশ পড়ার পরেই কবি এটি রচনা করেন, কিংবা পূর্বোক্ত 'বসন্তোৎসব'-এর সঙ্গে তার কতটা যোগ ছিল—এসব জিজ্ঞাসা বর্তমান প্রসঙ্গে আবশ্যিক নয়। তাহলেও এখানেই বলে রাখা ভালো, দুটি আপাত-অসংলগ্ন রচনা, একটি গীতিমালিকা আর একটি অর্ধস্ফুট নাট্যরূপকে কবি পারস্পরিক যে-সম্পর্কে বাঁধতে চেয়েছিলেন—সেও তাঁর অন্তর্ভাবনার পরম্পরা-জাত। কবি-কথানুসারে দুটি লেখাই অভিন্ন প্রতীতি-সম্ভূত, "শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।... বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ-প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলেছে।"[১২] এখানে প্রকৃতি-জগৎ সম্পর্কিত প্রতীতিটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ; 'মানুষ-প্রকৃতি' সম্পর্কে তা কবির ব্যক্তিগত প্রত্যয়-সাধিত ; আর দ্বিতীয় ভাবনাটি তাঁর চেতনায় সিদ্ধ হতে পেরেছিল প্রথমটির প্রামাণিকতাসূত্রেই। আপন মনঃপ্রতীতির সেই পূর্বাপরতা—সেই 'সিকোয়েন্স' অনুসরণ করে কবি পাঠক-দর্শকের প্রতীতি সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সার্থক হয় নি ; শেষ পর্যন্তই হল যে না, 'মনকথা'-কে 'কবিত্ব'-রূপে 'প্রকাশ' করতে গিয়ে ধাপে ধাপে কবিকে তা অনুভব করতে হয়েছে।

নাটকের অন্তে দর্শক যদি 'অর্থ দাবি' করে, তাহলে নাট্যকারকে 'নিরুত্তর' থাকতেই হবে, 'বসন্তের পালা'র ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন।[১৩] তাহলেও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঐ বছরেই 'ইস্টারের ছুটিতে' 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হয়েছিল,[১৩ক] —অবশ্যই শান্তিনিকেতনে, এবং সে ঐ 'সবুজপত্র'তে প্রকাশিত রূপটিই। চৈত্রমাস, ইদানীন্তন হিসেবে খ্রীষ্টাব্দের মাঝ-মার্চ থেকে মাঝ-এপ্রিল অবধি ; আর ইস্টারের ছুটিও তো এপ্রিল মাসের ঘটনা! 'বসন্তের পালা' ছিল তখন অখণ্ড আকারে ; তার অদলবদলের প্রয়োজনবোধ জাগল আরো প্রায় দশ মাস পরে, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের জন্যে চাঁদা তুলে কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের প্রসঙ্গ যখন এল ১৩২২-এর মাঘ মাসে। অভিনয় হয়েছিল ১৯১৬-র ৩০ জানুয়ারি।[১৪] তখনই

কবির মনে 'প্রকাশ'গত অনচ্ছতার ভাবনা জেগেছিল নূতন মাত্রায়। গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'ফাল্গুনী' "...জিনিসটি অত্যন্ত ডেলিকেট—ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়।"—'মানে বুঝতে' না-পারার সমস্যাটাও ভারি ভাবিত করেছিল ; এমন কি 'নাট্যবিষয়সার' নাম দিয়ে একটা ছাপানো 'প্রোগ্রাম' অভিনয়ের আগের দিন বিলি করে 'শ্রোতাদের বোঝবার সুবিধা' করে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন।[১৫] ঐ উপলক্ষেই 'ফাল্গুনী'র গ্রন্থিত রূপের আদিতে বিন্যস্ত 'সূচনা' অংশ-যে নতুন করে লিখে যোজনা করেছিলেন,—সে খবরও আছে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা ওই চিঠিতেই।

লক্ষ করলে দেখব, প্রকাশের প্রসাধনে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছিল না কবির। না-হবারই কথা। সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।"[১৬] এখানে গোটা রচনাটাই যে রচয়িতার নিজের জন্যে, তাকে সবার জন্যে গড়তে গিয়ে পরিমার্জনার শেষ নেই, তৃপ্তিও নেই। তাই দেখি রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপি[১৭] কিংবা ১৩২২-এর মাঘ সংখ্যা 'সবুজপত্র'তে 'বৈরাগ্যসাধন' নামে 'সূচনা'র যতটুকু অংশ ধরা ছিল, তার পরেও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল অভিনয়ের সময়ে,—যার মুদ্রিত রূপ দেখি 'ফাল্গুনী' গ্রন্থে। আসলে ওই পরিবর্ধিত অংশটিও 'নাট্যবিষয়সার', 'শ্রোতাদের বোঝবার সুবিধা'র জন্যে পরিকল্পিত।

একই কারণে 'বসন্তের পালা'রও রূপবিপর্যয়। প্রকৃতির জগৎ থেকে উঠে-আসা তথ্যবাহিত সত্যের যে আভাস মানুষের জগতেও অবধারিত, তারই যোগাযোগটা চোখেদেখার মতন আকারে ধরিয়ে দিতে প্রতি দৃশ্যের প্রারম্ভে 'বসন্তের পালা'র কয়েকটি করে গান জুড়ে দিলেন ভাবভূমিকার আকারে। সেই বিখ্যাত অভিনয়ের আগে নিশ্চয় কবি ভেবেছিলেন, নাটক ইন্দ্রিয়গোচর শিল্পই : চোখ দিয়ে যা-দেখি, কান দিয়ে যা-শুনি—তাই জড়িয়ে নাটকের অব্যবহিত আবেদন। তাই বুঝি চোখ-কানের সংশয়ভঞ্জন করতে এই নূতন ব্যবস্থা। অথচ ভাবের জোড় মেলানো গেল কই, অমন জুড়েতেড়েও!

'সবুজপত্র'তে 'বসন্তের পালা'য় ১৩টি গান বিন্যস্ত হয়েছিল তিনটি স্বতন্ত্র ভাবপর্যায়ে :—'নবীনের আবির্ভাব', 'প্রবীণের দ্বিধা' এবং 'নবীনের জয়'! 'নবীন', বলাই বাহুল্য, বসন্ত—নবফাল্গুন ; প্রবীণ শীতপ্রকৃতি। প্রবীণ যখন হাড়ে চেপে বসেছিল প্রকৃতির, তখনই তার মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে ওঠে নবীনের, —নববসন্তের আগমন শিহরণ ; প্রবীণ কেঁপে ওঠে শিরায় শিরায়—শেষ পর্যন্ত নবীনের জয়, এইটেই ভেতরকার ভাব। অন্যপক্ষে 'ফাল্গুনী' নাটকে দৃশ্য ছিল চারটি ; পাণ্ডুলিপিতে তার শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'সূত্রপাত', 'সন্ধান', 'শ্রান্তি', 'সমাপ্তি'। 'সবুজপত্র' থেকেই শেষ দৃশ্য দুটির শিরোনাম পালটাল 'সন্দেহ' এবং 'প্রকাশ'। অতএব নূতন পরিকল্পনায় 'বসন্তের পালা'র তিনটে পর্যায় ভেঙে এবারে হল 'ফাল্গুনী'র চারটি গীতিভূমিকা। রদবদলটা এইরকম : 'বসন্তের পালায়' পর্যায়ক্রমে গানের সংখ্যা ছিল ৩, ৫, ৫। 'ফাল্গুনী'তে প্রথম দৃশ্যের গীতিভূমিকায় প্রথম তিনটি গানই আছে, দ্বিতীয় দৃশ্যের মুখবন্ধে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম চারটি গান, তৃতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকা গড়া হল দুটি গান দিয়ে, প্রথমটি নতুন সংযোজন—'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি'—'বসন্তের হাসির গান' এটি, দ্বিতীয় গানটি পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গান। চতুর্থ দৃশ্যের গীতিভূমিকা 'বসন্তের পালা'র তৃতীয় তথা শেষ পর্যায়ের প্রথম চারটি গান নিয়ে ; পঞ্চম এবং 'বসন্তের পালা'র অন্তিম গান স্থানচ্যুত হয়ে হল 'ফাল্গুনী' নাটকের সমাপ্তিসংগীত। গীতিভূমিকার শিরোনাম ১, ২, ৪ দৃশ্যে 'বসন্তের পালা'র নাম ধরেই হল, কেবল দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকায় নতুন নাম হল 'প্রবীণের দ্বিধা'।

সব মিলিয়ে চোখের সংশয় এই গায়ে-গায়ে-জড়ানো রূপের আদলে ঘুচল কতটা কে জানে! কিন্তু ভাবের ফাঁক ভরাট হল না। কবিও সে কথা বুঝেছিলেন। প্রথম গীতিভূমিকা-দুটির ভাবচিত্রের সঙ্গে ['নবীনের আবির্ভাব', 'প্রবীণের দ্বিধা'] সংশিল্ষ্ট দুটি দৃশ্য-বিষয়ের ['সূত্রপাত', 'সন্ধান'] কোনো অনায়াস অন্বয় নেই ; দ্বিতীয় দৃশ্যে গীতিভূমিকায় যখন 'দ্বিধা'র দোলা চলেছে, দৃশ্যের ভেতরে তার কোনো ছাপ নেই। আর ততীয় দৃশ্যে পরস্পর-বিরোধিতা প্রকট ; প্রকৃতিতে 'দ্বিধা'র অবসান হয়েছে, অথচ মানুষের জগতে 'নবযৌবনের দল' তখনো 'সন্দেহে'র নিরেট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই শেষ পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "চোখ এবং কান এ দুয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুলতে হবে। তারপরে মানে বুঝতে না-পারে না-ই পারলে—বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াই দরকার।[১৮] তাই করা হয়েছিল ; বাগর্থবাহিত মাধ্যমে যে-প্রতীতিকে কিছুতেই সংবেদ্য 'প্রকাশ' দেওয়া গেল না, সুরের ঝংকারে রূপের আবেশে তাই দিয়ে অভিভূত করে দেওয়া গেল দর্শকের বিস্মিত চেতনাকে। 'বেণুবন, ফুটন্ত চাঁপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, শালের কচিপাতা ইত্যাদির'ও চোখে-দেখার মতো রূপ ধরে দিতে চেয়েছিলেন গীতিভূমিকাগুলির গানের হাটে।[১৮ক] 'সূচনা'য় কবিশেখরও বলেছিলেন, "...এসব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।"[১৯] বাঁশির ধর্মেই 'ফাল্গুনী'র শিল্পগুণ, নাট্যচরিত্রে নয়—যে-বাঁশি কত দিন ধরে বিচিত্র উপলক্ষে বেজেই আসছিল কবির 'মনোমাঝে'। সেই 'মনকথা'র হিসেব ধরেই অত কথা!

ভাবনাটা অনেক দিন ধরেই সঙ্গ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ; অন্তত ১৯১৩-র বর্ষান্তভাগে য়ুরোপ-আমেরিকা ঘুরে দেশে ফেরার পরেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি বাক্যে লিখেছেন, ৪ অকটোবর বোমবাই ফিরে সেখান থেকে "কলিকাতা আসিয়া আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধিতার কথা শুনিয়া বিরক্তচিত্তে শান্তিনিকেতনে গমন।"[২০] তাহলেও প্রধান ধাক্কাটা লেগেছিল দেশের—সমাজের দিকে চেয়ে ; অনেক দিন দেশছাড়া থাকার পরে। আসল মর্মমন্থন চলেছিল মানুষের পরিণতি-চিন্তা ঘিরে। মানবিক মূল্যবত্তার নিরন্তর 'অভিব্যক্তি'র বিশ্বাসে টেনে-বাঁধা ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-চেতনা ; কেবল 'মানুষের ধর্ম', 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন'-আদি প্রবন্ধমালাতেই নয়, গদ্য-পদ্য সকল রচনাতেই মানবিক বিবর্তনের নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ে ছিল তাঁর প্রধান ঝুঁকি। মানুষের সভ্যতার, মানবধর্মের অবনমনে বারে বারে বিচলিত হয়েছেন কবি। এবারে তাই নিয়ে অভিঘাত মনের অন্দরে ধাপে-ধাপে বেড়ে হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এক সময়ে। শুরুতে 'আত্মীয়দের বিরোধিতা'র মধ্যেও ব্যক্তিস্বার্থ-লোভাতুরতার হুল বিঁধেছিল বুঝি আপন মানব-প্রত্যয়ের গভীরে!

অন্যপক্ষে 'স্বদেশী'র দেশজোড়া আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলেও শেষ পর্যন্ত কবির সন্তর্পণ প্রত্যাশা ছিল অমেয়। ১৯১১-র ডিসেমবরে ভাঙা বাঙলা যেভাবে জোড়া লাগল, ভরসার বিষয় তাতে সামান্যই ছিল। তাহলেও ১৯১২-র প্রারম্ভ থেকে বিদেশযাত্রার উৎসুকতা, অসুস্থতার দরুন প্রথম প্রয়াসে বাধা—অবশেষে মে-মাসে দেশ ছাড়ার ঘোরে সেদিন অনেক অনুভবই একাগ্র হতে পায় নি। দেশে ফিরে এসেই যে-ছবি দেখলেন, অতি-হিসেবি 'প্রবীণ'দের গুছিয়ে নেবার লুব্ধতা—'ফাল্গুনী'র 'বৈরাগ্যবারিধি'-ধারক শ্রুতিভূষণে যে-প্রবৃত্তির প্রকট প্রকাশ—তাতেই আপন দেশে-সমাজে মানুষের পরাভবের মসীচিত্র বিচলিত করেছিল কবিকে। তারই প্রতিকার-চিন্তা হতে 'সবুজপত্র'-র জন্ম ; তার প্রথম সংখ্যায় 'সবুজের অভিযান' কবিতা আর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধের আবির্ভাব! শেষোক্ত রচনায় সমসাময়িক জীবন এবং কবিভাবনার ইতিহাস বৃত্তায়িত। অবদমিত যৌবনের বিভ্রান্তির বেদনাই চিরকালের যৌবনপ্রিয় মনকে আঘাত করেছিল বেশি। অতএব যৌবনের জাগরণব্রতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। লিখেছিলেন, "পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি।...এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে।...এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মী ছেলে হইয়া ঠান্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে।...বিজ্ঞমানুষের ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। আমাদের দেশে সেই জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া কি নাই। নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদের জন্ম দেয়।"[২১] অতএব নিরন্তর প্রাণের প্রবাহ খুঁজতে শুরু হল জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া যৌবনশক্তির সন্ধান। ধাপে-ধাপে তার বিচিত্র বিকাশ ঘটতে লাগল, পরিবেশের চাপ যতই জমাট বাঁধতে থাকল মনোভাবনায়।

কিন্তু আরো একটা পর্যায় এল, যখন বাইরের অভিঘাতের চাপ ঠেলে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার তাড়াটা হল আত্যন্তিক। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'র প্রথম প্রকাশ 'সবুজপত্র'র ১৩২১ বৈশাখ সংখ্যায়, খ্রীষ্টাব্দের তখন মাঝ-এপ্রিল থেকে মাঝ-মে, ১৯১৪। আর ২১ মে তারিখেই রামগড় থেকে এন্ড্রুজকে লিখলেন,

"মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন।...যা মরে গেছে তা নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অনুচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়।...মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতে পৌঁছতে হয়।"[২২] এরই নাম অনির্বচনীয় মর্মমন্থন, ভারসমতাচ্যুত পারিবারিক স্মৃতির ব্যক্তিক বেদনা যদি তার মর্মলীন হয়ে থাকেও।[২৩]

তার দিন দুই আগে মনটা যখন অপেক্ষাকৃত প্রসন্নতায় দুলছে—মনের দোলাচলবৃত্তি চলেছে তখনো একটানা—তখনই লিখলেন 'বলাকা'র দু-নম্বর কবিতা—"এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।" অনেক দিন পরে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তখন, শান্তিনিকেতনে ঐ কবিতা পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন, "য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎ-বার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে। এন্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান-প্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।"[২৪]

সেই একই প্রতীতি মনে মনে আনাগোনা করছে, ভরসায় অথবা বেদনায়—যেমন দেখি এই কবিতায় এবং চিঠিতে—চারদিকে ঘনিয়ে-আসা রক্তাক্ত মৃত্যুর সমুদ্র পেরিয়ে পাড়ি দিতে হবে 'নবযুগের অরুণোদয়ে'র, 'অমৃতে'র সন্ধানে। এরই মাঝে মৃত্যুর অতলান্ত চাপ মর্মান্তিক হয়ে বিঁধল ৪ অগস্ট,—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন ঘোষিত হল। এবারকার সংকট বিনাশের অপরিমেয়তা নিয়ে নয়—কবির পক্ষে এ ছিল অনেকটাই অস্তিত্বের সংকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রথম বারের চেয়ে অনেক ভয়ানক হয়েছিল নিঃসন্দেহে ; কিংবা সম্ভাবিত তৃতীয়টির শেষে মানবসমাজের উৎসাদন আনুপূর্বিক হবে কি না—এ প্রশ্ন বড়ো নয় বর্তমান প্রসঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মানবিকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছিল আমূল। মানুষ মানুষকে এমন করেও হানতে পারে, এ-বিভীষিকা চেতনাকে ভেতর হতে আঘাত করতে লেগেছিল। তখন থেকেই 'মৃত্যু' এবং 'অমৃত', রক্তক্ষরণ আর নবীন 'অরুণোদয়'-এর ভাবনা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারপাশে বৃত্তাকারে ফিরে চলল—যুদ্ধের বীভৎসতা আর যুদ্ধোত্তর মোক্ষণ-কামনা! 'ফাল্গুনী'র স্বত-উৎসারবিন্দুতে রয়েছে এই আন্তরিক উৎকণ্ঠার বিস্ফোরক চাপ।

যুদ্ধারম্ভের দিনে মন্দিরে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে—আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে—তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!...সেই জন্যেই তো এই প্রার্থনাঃ মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই-সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্টি হয়েছে সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব ;...।"[২৫] আর পুরো 'ফাল্গুনী' রচনা শেষ করার দেড় বছরেরও বেশি সময় পরে—যুদ্ধ চলছে তখনো—তার অর্থ বুঝিয়ে বলেছিলেন, "ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্তোৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো কেবল আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবেই তো নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বললে আনব সেই জরাবুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই।...সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলেছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের চির-নবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করে পাঠিয়েছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে।"[২৫ক]

লক্ষ করলে বুঝব, শান্তিনিকেতনমন্দিরে যে-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা হয়ে ঝরেছিল, এখানে তাই সুনিশ্চিত প্রত্যয়। মৃত্যুর আপন হাতের পরিমার্জনায় অনাগত 'অমৃত'-র প্রকাশপথ নির্মল হতে পারবে, তার কঠোর আঘাতে ঝরে-ঝরে পড়বে যা-কিছু অবসন্ন—জরাগ্রস্ত ; এ-অনুভবে ফাঁক নেই কোনো। 'ফাল্গুনী'-র ভাবানুভব এ-দুয়ের মধ্যবর্তী ; প্রথম প্রত্যাশার সিঁড়ি ভেঙে ব্যক্তি-গত প্রতীতিতে উত্তরণের রহস্য-ভাষে বিধুনিত তার বাণীরূপ। কিন্তু কথার জন্ম তো মনঃকল্পনার মন্থনে, সে-কথা নীরব সরব যেমনই হোক। অনেক দিনের সঞ্চিত অনেক অনুভাবনার পুঁজি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে মনের অন্দরমহলে,—এখানে ওখানে এলোমেলো হয়ে। স্মৃতি এবং আগ্রহের সুতোয় তারই ইচ্ছানির্বাচিত বিচ্ছিন্ন টুকরো-যত মালা গেঁথে গড়ে ওঠে প্রাথমিক প্রতীতির রূপ—'মনকথা'য় যার অঙ্কুর-আভাস।

'ফাল্গুনী' রচনার মুখে শান্তিনিকেতনে চলে আসার আগে হিতসাধনমণ্ডলীর সভা হয়েছিল ; পারিপার্শ্বিক পরিবেশে স্বদেশহিতের সাধন-চেষ্টাই ছিল উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য।[২৬] সেখানেও কথা বলতে-বলতে সমকালীন মনের প্রথম পুঞ্জিত ভাবনাটি আপনা থেকে প্রকাশিত হয়ে এল, "যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার মতো দৌরাত্ম্য আর হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গে ফিরতে হবে।"[২৭] কিন্তু য়ুরোপের সমস্যা ভারতের নয়, একথাও রবীন্দ্রনাথ সঠিক জানেন। তবু আমরাও যে 'মরছি' ; 'একেবারে উল্টোদিক হতে' হলেও।[২৮] তার উপায়? কবির জবাব, "তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন—বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও।...আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো। কে করবে। দেশের যৌবন—যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।"[২৯]

চারপাশে স্তরে স্তরে সঞ্চারিত মৃত্যুমারী জরা-জড়তার উত্তরণে যৌবনশক্তি—প্রাণের শক্তির সঞ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা ঘোরাফেরা করছিল মনে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'র কাল থেকেই। তারই পূর্বে-উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে 'কর্মযজ্ঞ'-র সদ্য-ধৃত অংশটুকুও মিলিয়ে পড়লে 'ফাল্গুনী'র নব-যৌবনের দল-এর কবি-ভাবিত অন্তঃস্বভাবটিকে চেনা হয়তো আর অসম্ভব মনে হয় না। 'প্রবীণ'-এর ভেতরকার চেহারাটাও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে :—"যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য—কারণ তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক তাঁহারা প্রবীণ।"[৩০] আর 'ফাল্গুনী'র দাদার পরিচয় দিতে ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, "ইহারা যাহাকে দাদা বলে তাহার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে।"[৩১] ভেবে চমক লাগে, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'র কতদিন আগের ভাবনাটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে 'ফাল্গুনী'র কল্পলোকে! তার চেয়ে গভীরে খুঁজতে হয় চিত্ততলের তোলপাড় আলোড়নের চেহারাটি, যার টানে দূরের ভাবনা কাছের কথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'শেষ খেয়া' কবিতা আছে 'বলাকা'য় [৬০ সংখ্যক] ; ১৩২২-এর ২৩ কার্তিকে রচিত। 'ফাল্গুনী' প্রথম রচনার মাস সাতেক পরের লেখা ; আর 'ফাল্গুনী'র ব্যাখ্যাসূত্রে পূর্বধৃত নিশ্চিত প্রত্যয়ের প্রকাশ তার দু বছর পরের ঘটনা। যুদ্ধজনিত মনোমন্থনটা ঐ কবিতায় দুর্বার! তারই কথা বলতে এন্ড্রুজ বলেছিলেন, "...বিশ্বাসের যে প্রবল শক্তির প্রকাশ এ কবিতায়—তার প্রয়োজন তখনই যখন পুরাতন পৃথিবীর আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে নূতন সৃষ্টির উপকূলে, নবজীবনের অভিসারে প্রলয়পারাবার নির্ভয়ে পাড়ি দিতে হবে।"[৩২]

কবির ব্যক্তিচেতনার অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা, সেই 'পাড়ি'টা জমে উঠুক নবযৌবনের দুর্মর সামর্থ্যে। পরিবার-জীবনের অসংলগ্নতা, দেশের চলমান দুর্বিপাক, সবার ওপরে 'ফাল্গুনী'র উন্মোচনলগ্নে ক্রান্তি-বিন্দুতে কাঁপছিল সমগ্র চেতনা,—বিশ্বজীবনজোড়া মহামারণঝঞ্ঝার আঁধি পেরিয়ে 'পাড়ি'টা জমুক। কিন্তু সে যে সম্ভব হবেই, 'রাত্রির তপস্যা'-শেষে 'দিন' আসবেই—'মৃত্যুর অন্তর' বিদীর্ণ করে 'অমৃত' উঠবেই উদ্ভাসিত হয়ে, তার কোনো প্রামাণিক আশ্রয় মেলে নি তখনো মনে-মনে। অমূলকল্পনা রবীন্দ্রনাথকে কখনো অবনমিত করতে পারে নি ; বিজ্ঞান-দর্শন-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অভিপ্রায়ের সমর্থন নেই, কল্পনায় তাকে প্রশ্রয় দেন নি কোনোদিন। অতএব পৃথিবী-জোড়া রক্তাক্ত বিভীষিকায় ঘেরা পড়ে আপন উত্তরণ-প্রত্যাশী তীক্ষ্ম বাসনার প্রামাণিক আশ্রয় খুঁজে ফিরছিলেন যেন দুহাতে আপন মনপ্রাণ বাড়িয়ে। এমন সময়ে হঠাৎই চেতনার গভীরে মিলে গেল প্রকৃতির ছাড়পত্র ; অন্তরে প্রোথিত হল। রবীন্দ্র-প্রাণচেতনার ধাত্রী প্রথমাবধিই তো প্রকৃতি!—"জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান—অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে,

ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না।"[১৩] অমনি মনে এল মানুষও তো বিশ্বনিয়মের অঙ্গ ;—মনে হল, আগে দেখেছি, প্রতিবর্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে শীতের শেষে ফাল্গুন-সমাগমের যে লীলা, মানুষের মধ্যেও তেমনি "প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে।"[১৪] এই প্রতীতির নিশ্চিত স্বাক্ষর মনে যেমনি পৌঁছাল, অমনি ভারমুক্ত চেতনা পুলকিত বিস্ময়ে কথা বলে উঠল আপনা থেকে। প্রতীতি প্রত্যয়ে পরিণত হবার ভেতরকার টানাপোড়েন অনেক,—কিন্তু 'ফাল্গুনী' কবির অনেক দিনের জগদ্দল পাথরচাপা মনের হঠাৎ হালকা হয়ে-যাওয়ার মনের-খুশিতে বলে-ওঠা কথা!

তাহলেও প্রথমেই নাটক নয়, নয় মানুষের সমস্যা-মুক্তির সংকেত-সম্ভাষ! প্রথম গানের ঝরনাধারাই নেমেছিল মনে ; কবি নিজেও বলেছিলেন, "...গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন গুন করতে লেগে গেছে।...'ফাল্গুনী'র গান ঘুরছে মনের মাঝে।"[১৫] খুঁজলে দেখি, গানগুলো প্রধানত 'বসন্তের পালা' তথা গীতিভূমিকাগুলিরই। 'বসন্তের পালা'র পাণ্ডুলিপি মেলে নি ; কিন্তু ঐ গানগুলো ধরা আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে ১৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে।[১৬] যথার্থই গানের ঢল নেমেছিল কবির মনে, আকাঙ্ক্ষিত সত্যের দিশাটুকু ধরতে পেরেই। তাকিয়ে দেখি, ১২ ফাল্গুন রাতে লিখেছিলেন, সুরুলে—'ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে' আর 'ছাড়গো তোরা ছাড়গো' গান দুটি। ১৩ তারিখ সকাল হতে রাত অবধি লেখা হয় ৭টি গান। ১৪, ১৫ এবং ২০ ফাল্গুন রাতেও গান লিখেছেন ; এবং, দেখেছি, তার পরেও। 'ফাল্গুনী' লিখতে শুরু করেছিলেন ২০ ফাল্গুনে—তার আগে অবধি মনেপ্রাণে প্রকৃতির গভীরে তলিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন—আবিষ্কার করেছেন তিলেতিলে প্রকৃতির বুকচেরা বসন্তের উদ্ভাস—জরা-জড়তার মর্মভেদী নববসন্ত—নবযৌবনের আনন্দ-হিল্লোল!

গানে গানে প্রকৃতি-প্রাণের যে প্রামাণিক ছবি পূর্ণবর্ণায়িত হল, তাকে ধরেই মানুষের ইতিহাসের সত্য রূপচিত্র অস্ফুট রূপরেখার আভাসে আঁকা হল 'ফাল্গুনী'-তে। 'বসন্তের পালা' লেখা যখনই হোক, তার গানগুলোর প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের সূত্র বেয়ে 'ফাল্গুনী'র প্রতীতিতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন নিজে,—এই আন্তরিক প্রেরণার বশেই শেষ পর্যন্ত 'বসন্তের পালা' আর 'গীতিভূমিকা'কে ডালার আকারে সাজিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ পাঠক-দর্শকের প্রতীতি সাধনের আকাঙ্ক্ষায়।

তা ছাড়াও মনের মূল বিক্ষেপটুকু ঐ 'খেয়াল-নাটকের'র পদে-পদে উঁকি দিয়েছে—সকল অস্ফুটতা অনচ্ছতাকে ছাপিয়ে। আসল সমস্যা তো অপারপাথার অন্ধকারে মানুষের সাঁতরে পাড়ি দেবার! 'ফাল্গুনী'র গোটা তৃতীয় দৃশ্য আর চতুর্থেরও অনেকটা জুড়ে দ্বিধা-সংশয়, হতাশ-আক্ষেপের নিরেট অন্ধকারে হাতড়ে ফেরার ছবিটি জমাট বেঁধে আছে, যেমন আছে 'শিশুতীর্থ' কবিতার মাঝে পথভ্রান্ত মানুষের জমেযাওয়া আর্ত কণ্ঠস্বর।[১৭] প্রথমটির মূলে ছিল যুদ্ধকালীন আত্মপ্রহত মানুষের বিভীষণ রূপানুভব, শেষেরটি উঠে এসেছে যুদ্ধশেষে তারই স্মৃতি-অভিজ্ঞতার মর্ম মন্থন করে।

সে যেমনই হোক, যুদ্ধ-প্রসঙ্গে খতিয়ে না দেখলে 'ফাল্গুনী'র আন্তর প্রতীতিও নিজের কাছেই বুঝি যথেষ্ট গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। ফলে এলোমেলো কথার ফাঁকে নাটকের পক্ষে আরোপিত কখনও জুড়ে পড়েছে নির্দ্বিধায়। বস্তুত 'ফাল্গুনী'র রূপকথাবিষ্ট আজগুবি কথামালায় কবির অভিপ্রেত অনেক প্রসঙ্গই আরোপিত। নাট্যরূপের প্রতীতিযোগ্য প্রকাশ তাতে আরো শিথিল হয়েছে এই পরম্পরা-বিচ্ছিন্নতার দরুন। প্রথম দৃশ্যের আনন্দ-হুল্লোড়ে যে-করে 'সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো'র প্রসঙ্গ এল, কিংবা দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে যে-করে 'একজন বালক' প্রবেশ করেই আকুল আর্তিতে ভেঙে পড়ে—"আমি পারলুম না, ধরতে পারলুম না", তখনো ঐ 'বুড়ো'টির পরিচয় কিংবা অবস্থান সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না পাঠক-দর্শকের পক্ষে। আসলে এ-সবই 'বসন্তের পালা'য় ধরা কবির ব্যক্তিগত প্রতীতির আরোপণ নাট্যদেহে—প্রকৃতি থেকে মানুষের প্রকৃতিলোকে।

ঠিক একই পথ ধরে এসেছে সেদিনের প্রথম প্রাণের বাণীটি কবির!—চতুর্থ দৃশ্যে চন্দ্রহাস আরো একবার নিরুদ্দেশ হয়েছে ; সন্দেহে আশঙ্কায় অধীর নবযৌবনের দল চেপে ধরে অন্ধ বাউলকে, "দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই।" তার জবাবে হঠাৎই বাউল বলে ওঠে :—"সে বললে যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ"। 'ফাল্গুনী'র পাঠক-দর্শকের মতো নাটকের কুশীলবেরাও বিস্মিত—বিমূঢ় হয় বুঝিবা আকস্মিক বাণীর অভিঘাতে! বাউলের কিছু যায় আসে না তাতে 'ফাল্গুনী'র আচমকা প্রতীতি-পুলকিত অন্তর্মগ্ন শিল্পীর মতোই ; আরো সে বলে চলে, চন্দ্রহাসের মুখের কথা,—"খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।" তাই, "যারা মরে অমর, বসন্তের কচিপাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে 'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসেব রাখি নি—আমরা ছুটে এসেছি, ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতাম, তাহলে বসন্তের দশা কী হত?"

—এ প্রশ্ন তো মানুষের ইতিহাসে চির বসন্তের সন্ধানী কবিরও ; প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়েই কেমন উঠে এল উত্তরটি প্রকৃতি-চিত্রের হাত ধরে পৃথিবী-জোড়া 'লড়াই'-এর রঙ্গভূমি পর্যন্ত। এই অপরূপ প্রাপ্তির মূল অবধি আলোড়িত করে কেঁপে উঠল যে অন্তঃশায়ী বাণীর ঝংকার, তার উৎসমূলে আছে 'বসন্তের পালা'র পালা-বিহীন গীতানুভবের সুরমূর্ছনা। তাই বলছিলাম, বাক্-চরিত্রের বিচারে 'ফাল্গুনী' শিল্পী রবীন্দ্রনাথের স্বগতভাষণ, আর 'বসন্তের পালা'র গানের ডালি কবি-ব্যক্তির অন্তরে অন্তরে তার আন্তরিক অনুঘটক।

নির্দেশপঞ্জী

[১] 'সাহিত্যের সামগ্রী'—'সাহিত্য', রর ৮, পৃ ৩৪৩
[২] অপরাপরের মধ্যে দ্র. 'বাঙ্গালি কবি নয়', 'ভারতী', ১২৮৭, ভাদ্র পৃ ২২০-২২১
[৩] 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ (১৩৬৮), পৃ ৪০৭
[৪] বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন-পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১২১
[৫] পাণ্ডুলিপিতে লিখিত 'ভূমিকা'র চেয়ে 'সবুজপত্র'-তে ধৃত কিংবা গ্রন্থভূমিকা দীর্ঘতর। সর্দার কিংবা দাদার পরিচয়সূচক অংশ পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত।
[৬] দ্র.
[৭] বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন-পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৩১
[৮] তদেব
[৯] তদেব
[১০] যথাক্রমে পাণ্ডুলিপি ১২১-এর ৩৫ এবং ১৫ পৃষ্ঠায় ধৃত।
[১১] 'সবুজপত্র' চৈত্র ১৩২১, পৃ 'অ'
[১২] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, দ্র. 'স্মৃতি' পৃ ৮৮ ; অপিচ রর ১২ 'গ্রন্থপরিচয়' পৃ ৬০৭
[১৩] দ্র. 'সবুজপত্র' পূর্বোক্ত, পৃ 'অ'
[১৪] দ্র. 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী' পৃ ৬৯
[১৫] দ্র. রর ১২, 'গ্রন্থপরিচয়' পৃ ৬০৩ [গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি]
[১৬] 'সাহিত্যের সামগ্রী'—'সাহিত্য' রর ৮, পৃ ৩৪৩
[১৭] পাণ্ডুলিপিসংখ্যা [রবীন্দ্রভবন] ৩৬১। উভয় স্থলেই 'বৈরাগ্য সাধন'-এর শেষ হয়েছে শ্রুতিভূষণ সম্পর্কিত কবিশেখরের উক্তিতে "না মহারাজ, তার প্রতি তো আমার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।"
[১৮] গগনেন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোক্ত পত্র ; রর ১২, পৃ ৬০৩
[১৮ক] তদেব
[১৯] 'ফাল্গুনী', রর ১২, পৃ ৯৭
[২০] 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী' পৃ ৬৪
[২১] 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' : 'কালান্তর' : রর ২৪, পৃ ২৫৭-২৫৮
[২২] 'রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ পত্রাবলী' [অনুবাদিকা মলিনা রায়] পৃ ৭
[২৩] দ্র. চিঠিপত্র ২, [রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি]

[২৬] রর ১২, 'গ্রন্থপরিচয়', পৃ. ৫৯৭
[২৭] 'মা মা হিংসীঃ' : 'শান্তিনিকেতন' : রর ৪৯২
[২৮] দ্র. রর ১২, 'গ্রন্থপরিচয়' পৃ. ৬০৮
[২৯] রবীন্দ্রজীবনী ২, (পূর্বোক্ত) পৃ. ৪০৬
[৩০] 'কর্মফল' : 'কালান্তর' : রর ২৪, পৃ. ৩৯০
[৩১] তদেব
[৩২] তদেব
[৩৩] 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' : তদেব পৃ. ২৫৫
[৩৪] দ্র. 'সবুজপত্র' : পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০৭ ; 'অপিচ' 'ফাল্গুনী' : 'গ্রন্থপরিচয়' : রর ১২ পৃ. ৫৯৯
[৩৫] 'রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ পত্রাবলী' পৃ. ১১ [মলিনা রায়-কৃত অনুবাদ]
[৩৬] মনোরঞ্জন রায়কে লিখিত পূর্বোক্ত পত্র
[৩৭] তদেব
[৩৮] রবীন্দ্রজীবনী ২, (পূর্বোক্ত) পৃ. ৪০৭
[৩৯] দ্র. রবীন্দ্রভবন-পাণ্ডুলিপিসংখ্যা ১৩১ ; অপিচ রর ১২ : গ্রন্থপরিচয় : পৃ. ৬০০
[৪০] দ্র. 'পুনশ্চ' : শিশুতীর্থ : ৫, ৬, ৭ স্তবক : রর ২৪, পৃ. ১২৮-১৩০

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

এগারো

ডিনারের পর বিলিতি কেতা মেনে মহিলারা অন্য ঘরে যান। পুরুষরা তখন স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। স্বপনদা রিফ্রিজেরাটর থেকে একটি বোতল বার করে বলেন, "বোর্দো। আমার সমবয়সী। বিশ বছর আগে ফ্রান্সে কেনা। আরো তিনটে ছিল, খরচ হয়ে গেছে, এটিই এখন সবে ধন নীলমণি। এরও তো প্রায় শেষ দশা। বিশিষ্ট অতিথি না হলে খুলি নে। সুকুমার আজকের দিনের চীফ গেস্ট।"

তা শুনে সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে পানপাত্র হাতে টোস্ট প্রস্তাব করে। "টু দ্য হেলথ অভ দ্য লস্ট রোমান্টিক অভ বেঙ্গলি লিটেরেচার, স্বপনমোহন গুপ্ত।"

স্বপনদা তখনো তাঁর পরিবেশন সারা করেন নি। "সৌম্য তো মহাত্মা হতে চলেছে। মানসও আমাদের মতো দুরাত্মা নয়। এই দুর্লভ পানীয় আমি অপাত্রে অপচয় করব না। কমরেড চানু, তুমি তো ভডকা ছাড়া আর কিছু ঠোঁট দিয়ে ছোঁবে না। তোমার জন্যে এখন ভডকা পাই কোথায়? তোমাদের তিনজনকে কফিই দিচ্ছি। কারো আপত্তি আছে?"

সৌম্য আর মানস আপত্তি করে না। চানু স্বপনদার দিকে এমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় যে তাঁর মায়া হয়। তাঁর মনে পড়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি। সার ফিলিপ সিডনির মতো তিনি নিজের গ্লাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।"

চানু সংকোচের সঙ্গে তুলে নিয়ে মুখে দেয়। এদিক ওদিক তাকায়। বাবলী দেখছে না তো?

স্বপনদা নিজের জন্যে আরেক গ্লাস ঢেলে চানুর দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার পার্টি তোমাকে নির্ঘাত পারজ করবে। যদি টের পায় যে তুমি প্রোলিটারিয়ানদের প্রিয় পানীয় ভডকা ছেড়ে বুর্জোয়াদের মতো ক্ল্যারেট ধরেছ। পাবেই, চকোলেট তোমার মুখের গন্ধ থেকে টের পাবে।"

বেচারা চানু বাবলীর ভয়ে তেষ্টা ভুলে যায়। স্বপনদার দয়া হয়। তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন, "প্রাণ ভরে পান করো। ওটুকুতে নেশা হবে না। বাবলী ভালো করেই জানে যে অনেকেই ডুবে-ডুবে জল খায়।"

এর পর তাঁর খেয়াল হয় যে টোস্টের উত্তরে কিছু বলতে হয়। "সুকুমার আমাকে যে কমপ্লিমেনট দিয়েছে আমি তার যোগ্য নই। এই তো মানস রয়েছে। এ কি কম রোমানটিক? চান্দুদের দলেও রোমানটিক কবি আছেন। তবে তাঁরা বর্ণচোরা রোমানটিক। আগেকার দিনে প্রেমে পড়ার বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়ে যেত। রোমানসের অবকাশ ছিল না। এখন তো মেয়েরাও ছেলেদের কলেজে যাচ্ছে। কো-এডুকেশনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। রোমানটিক প্রেমের এই শেষ নয়, শুরু। কার কী মতবাদ সেটা তুচ্ছ। কার কী অনুভূতি সেইটেই আসল। মেয়েরা এখনো নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। যখন পারবে তখন দেখবে রোমানটিকতায় সাহিত্য প্লাবিত হবে। যেমন হয়েছিল ইউরোপে গত শতাব্দীর প্রথম পর্বে। ইউরোপের বিচারে আমিই হয়তো লাস্ট, কিন্তু এদেশের বিচারে তা নই। ধন্যবাদ সুকুমার। আমিও তোমার স্বাস্থ্য পান করি।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে মানস সুধায় সুকুমারকে, "এত নেতা থাকতে নেহরুর উপর বাজি রেখেছ কেন?"

"কংগ্রেস যেটাকে স্বাধীনতা বলছে সেটা ক্ষমতার হস্তান্তর ছাড়া আর কী? হস্তান্তর যারা করবে তারাই স্থির করবে কাকে হস্তান্তর করা যায়। নেহরু হচ্ছেন হ্যারো আর কেমব্রিজে শিক্ষিত। ইংরেজদের কাছে তাঁদেরই একজন। সোশিয়ালিস্টদের কাছেও তেমনি এক পালকের পাখি। বিলেতফেরতা অবশ্য আরো আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই শুধুমাত্র ব্যারিস্টার। এই যেমন গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, ভুলাভাই, লিয়াকত আলী। তাঁদের কারো হাতে ভারতের ভার দিলে ব্রিটেনের সঙ্গে কালচারাল ইউনিটি থাকবে না। জান তো, আমি ফেবিয়ান সোসাইটির পুরনো সভ্য। লেবার গভর্নমেন্টের বেশ কয়েকজনও তাই। আমি ন্যাশনাল লেবার ক্লাবেরও বহুদিনের মেমবর। ক্লাবে গিয়ে প্রথম কাজ বার থেকে এক-পেয়ালা মদ কেনা, কেউ সঙ্গে থাকলে তাঁকেও কিনে দেওয়া। তারপর লাউনজে বসে মদ হাতে আড্ডা দেওয়া। লেবার পার্টির কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে আলাপ হয়। লেবার গভর্নমেনটের রাজা-উজিরদের সঙ্গেও পরিচিত হই। ভিতরের খবর জানতে পারি। আসছে, আসছে, অবিলম্বে আরো এক কিস্তি রিফরমস আসছে। এবার সেনটারে। পুরোপুরি ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়েই সেনট্রাল গভর্নমেন্ট হবে। পরে তার হাতেই ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে। প্রত্যেক গভর্নমেনটের একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট থাকেন। ভারতের বেলা প্রেসিডেনটের কথা ভাবা যায় না। তা যদি হয় ব্রিটেনের রাজা ভারতেরও রাজা হতে পারেন না। ইংরেজরা সবাই রাজভক্ত। মায় শ্রমিকশ্রেণী। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করার মতো মহাপাপ তাদের দ্বারা হবে না। কিন্তু রাজাকে নামেমাত্র রাজা করতে তাদের বাধে না। কার্যত প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা। তেমন লোক ভারতে নেহরু ভিন্ন আর কে? তবে এর পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। মুসলিম লীগকেও সঙ্গে নিতে হবে। তা নইলে টোরি অপোজিশন বাগড়া দেবে। চার্চিল থাকতে মুসলমানদের ডুবিয়ে দেওয়া চলবে না। ও'র কাছে মুসলমান মানেই লীগপন্থী মুসলমান। কাজেই বেশ কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। কেউ বলতে পারছেন না শেষ পর্যন্ত কী হবে। ক্রিপসী কী যেন মুসাবিদা করছেন। তাঁর পেট থেকে কিছু বার করা অসম্ভব। তিনি মদ স্পর্শ করেন না। নিরামিষাশী।" সুকুমার একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

স্বপনদা দুই কাঁধ উঁচু করে বলেন, "এ জগতে সব কিছু অনিশ্চিত, কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত। জিন্নাকে নিয়ে কেউ গভর্নমেন্ট চালাতে পারবেন না। জিন্নাকে বাদ দিয়েও কেউ গভর্নমেন্ট চালাতে পারবেন না। জিন্না হচ্ছেন সেই দিল্লীকা লাড্ডু যাকে খেলেও পশতাতে হয়, না খেলেও পশতাতে হয়। নেহরু যদি গভর্নমেন্ট গঠনের দায়িত্ব নেন তাঁকেও পশতাতে হবে।"

মানস তর্ক করে, "কেন? ইংরেজরা কি পলিসি পরিবর্তন করতে পারে না? সরকার-মনোনীত সদস্যদের গোষ্ঠী যদি নিরপেক্ষ থাকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসেরই তো মেজরিটি। ব্রিটিশ পার্লামেনটারি প্রথা অনুসারে যে দলের মেজরিটি সেই দলের দলপতিকেই তো গভর্নমেন্ট গঠন করতে বলা হয়। আপাতত ভুলাভাই দেশাই করতে পারেন, পরে উপনির্বাচনে জিতে জবাহরলাল করবেন।"

"তা হলে তো জিন্না কোনো দিনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাঁর দল কোনো কালেই মেজরিটি হবে না। সেইজন্যেই তো তিনি পাকিস্তান দাবি করছেন। পাকিস্তান হলে সেখানেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। মুসলিম লীগ হবে মেজরিটি পার্টি। মুসলমান সম্প্রদায়

হবে মেজরিটি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়কে নেশন বলা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু তারও নজির আছে। ইহুদিরাও সেই কথা বলে ইহুদিস্তান দাবি করছে। ইংরেজরা এখন দোমনা। না পারে আরবদের চটাতে, না ইহুদিদের। এক্ষেত্রেও তাই। না পারে হিন্দুদের চটাতে, না মুসলমানদের।" সুকুমার ইংরেজদের পক্ষ নেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সেইজন্যেই তো বাপু বলেন, তোমরা হয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাও, নয় মুসলিম লীগের হাতে। আর নয় তো কারো হাতে ক্ষমতা না দিয়ে অমনি ভারত ছেড়ে যাও। দিনকতক অরাজকতার পর যে পারে সে গভর্নমেন্ট গঠন করবে। প্রাদেশিক স্তরে গভর্নমেন্ট গঠনে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও লীগ, কোথাও অন্যান্য দল এগিয়ে আসবে। কেউ বাধা দেবে না। গোলমাল যা হবে তা কেন্দ্রীয় স্তরেই। সেটাও মিটে যাবে, কংগ্রেস যদি জিন্নাকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ দেয়। নেহরুকে সবুর করতে হবে।"

"তা হলে আমার বাজি রাখা নিষ্ফল।" সুকুমার হতাশার ভান করে।

"ব্রিটিশ কর্তারা জিন্না সাহেবের হাতে একটা ভীটো ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বড়লাটের উপরেও ভীটো প্রয়োগ করে সিমলা বৈঠক বানচাল করলেন। এর পরে সেক্রেটারি অভ স্টেটের উপরেও তাই করবেন। ক্রিপস কেন মিছিমিছি আসছেন? জিন্নার হাতে ভীটো যতদিন থাকবে গান্ধীজী ততদিন সবুর করবেন। বয়স বাড়তে-বাড়তে যদি একশো বছর হয় তা হলেও তিনি ধৈর্য ধরবেন। এমন দিন আসবে যেদিন ব্রিটিশ কর্তারাই অধৈর্য হবেন। সে কথা ভেবে বাপু আর নতুন কোনো আন্দোলনের কথা বলছেন না। তাহলেও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। যদি ডাক আসে তবে সাড়া দিতে হবে। গঠনের কাজই সেই প্রস্তুতি। তবে কংগ্রেস আপাতত নির্বাচনে নামবে, এবং সফল হলে প্রাদেশিক স্তরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে।" সৌম্য যতদূর জানে।

মানস তাকে সতর্ক করে দেয়। "জিন্না সাহেব বলেছেন কংগ্রেস যদি আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে আর তাঁর দলকে বখরা না দেয় তবে তিনি তুলকালাম কাণ্ড করবেন। এদিকে আমাদের এখানকার কংগ্রেস নেতারাও প্রত্যাশা করছেন যে এখানকার প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের তাঁরাও শরিক হবেন। নয়তো তাঁরাও সহ্য করে যাবেন না। কারো কারো মাথায় প্রদেশভাগের চিন্তাও ঘুরছে। বাপু কি এসব জানেন না? তাঁর একশো বছর বয়স মানে তো আরো পঁচিশ বছর। কে ততদিন ধৈর্য ধরবে? বাঙলা আর পানজাব তো বিপ্লবীদের লীলাক্ষেত্র।"

"ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসছে।" স্বপনদা বেদনার স্বরে বলেন, "কর্ম থেকে কর্মফল—এটাই তো সাধারণ নিয়ম। কজ থেকে এফেকট। কিন্তু ইতিহাস পড়লে মনে হয় এফেকট আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কজ তার দিকে অনিবার্যভাবে এগোয়। যেমন চুম্বকের টানে লোহা। যুদ্ধ বল, বিপ্লব বল, এক-একটা চুম্বক। ঘটনার লোহা অপ্রতিরোধ্য গতিতে তার দিকে এগিয়ে যায়। দেশ গৃহযুদ্ধের অভিমুখে চলেছে। আমি নীরব দর্শক।"

"আমি নীরব দর্শক হতে নারাজ।" মানস দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

"আমিও কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারি? আমি সত্যাগ্রহী। প্রতিরোধই আমার কর্তব্য। সত্যাগ্রহীর অভিধানে অপ্রতিরোধ্য বলে কোনো শব্দ নেই। মানব-ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতক মানুষ প্রতিরোধ করে আসছে। সহিংসভাবেই বেশি, অহিংসভাবে কম। আজকের দিনে তাদের কর্তব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। গৃহযুদ্ধও তো যুদ্ধ। তার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ চাই। দেশ যে গৃহযুদ্ধের অভিমুখেই অগ্রসর হচ্ছে এর কি কোনো সন্দেহ আছে? মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি। কত রকম আজব তত্ত্বই না শুনছি। মুসলিম লীগ নেতারা বলছেন হিন্দু আর মুসলমান দুই নেশন। যেমন ইংরেজ আর আইরিশ। হিন্দুমহাসভার নেতারা বলছেন হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, মুসলমানরা এলিয়েন। যেমন ইংরেজরা এলিয়েন। তফাতের মধ্যে এই যে মুসলমানরা রেসিডেন্ট এলিয়েন। এসব কথা শুনলে কার না গা জ্বালা করে? কে না মারমুখো হয়? হিন্দুস্থানে মুসলমানরা যদি এলিয়েন হয়ে থাকে তবে সেই এলিয়েনদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র স্থাপন করলেই মামলা মেটে। নয়তো মামলায় লড়ো। হামলায় পড়ো। ইংরেজরাই বিচারক হয়ে একটা রোয়েদাদ দিয়ে নিষ্পত্তি করুক। আমরা একটা রোয়েদাদ দেখেছি। আরেকটা দেখতে চাই নে। জানি যে ইংরেজরা অপক্ষপাত নয়। কংগ্রেস তাদের

শত্রু লীগ তাদের মিত্র। শত্রুর চেয়ে মিত্রের দিকেই ওরা ঝুঁকবে। সেটাই স্বাভাবিক। শেষকালে দেখা যাবে হিন্দুর হাতে মুসলমানের কান আর মুসলমানের কানে হিন্দুর কান ধরিয়ে দিয়ে ওরা ক্ষমতার হস্তান্তর করেছে। ক্ষমতা পেয়ে আমাদের প্রথম কাজই হবে কৌরব-পাণ্ডবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কেউ কি অমন একটা কৃত্রিম সীমান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? বাঙলা আর বেহারের মধ্যে কোথায় প্রাকৃতিক সীমান্ত? পানজাব আর যুক্তপ্রদেশের মধ্যেই বা কোথায়? রোয়েদাদ মেনে নেওয়ার চেয়ে গৃহযুদ্ধই শ্রেয়, কিন্তু সেটাই বা অবশ্যম্ভাবী হবে কেন? একপক্ষ যদি বলে, আমরা যুদ্ধ করব না, তার বদলে সত্যাগ্রহ করব, তোমরা যদি এক-তরফা যুদ্ধ করতে চাও তো করো, তা হলে তেমন এক-তরফা যুদ্ধ আপনি থেমে যাবে। মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে এই কয়েক বছরে হিংসার প্রেস্টিজ, সামরিক শক্তির প্রেস্টিজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। জঙ্গি মনোভাব সর্বত্র। লোকের ধারণা অহিংসা হচ্ছে দুর্বলের অস্ত্র। সবলের অস্ত্র হিংসা। হিন্দুদের মধ্যেও একটা জঙ্গি মনোভাব ব্যাপক। শিখদের মধ্যে তো কথাই নেই। আর মুসলমানদের তো জঙ্গি ঐতিহ্য। আমরা কোন্ পক্ষকেই বা বলব যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহ করতে? নৈতিক প্রতি-রোধ করতে? দুই পক্ষকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে আমরাই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের মার খেয়ে প্রাণ হারাব।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"এই পাগলের সঙ্গে ক্যারামেলের বিয়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। এখন আর সংশোধনের উপায় নেই। মেয়েটা আবার বিধবা হবে ভাবতেও কষ্ট হয়।" স্বপনদা উত্তে-জিত হয়ে বলেন।

"ঘটনার গতি ভালোর দিকেও যেতে পারে। সবচেয়ে খারাপটা আমরা ধরে নেব কেন? ইংরেজরা সকলেই কি লীগের দুই-নেশন তত্ত্বের সমর্থক আর পার্টিশনের পক্ষ-পাতী? লেবার পার্টি সেটা পরিহার করতেই চেষ্টা করছে আর করবে। গৃহযুদ্ধও ইংরেজরা কেউ চায় না।" সুকুমার এটা বিশ্বাস করে।

"দ্যাখো, সুকুমার, ইংরেজরা কী চায় না চায় সেটা তাদের বিদায়মুহূর্তে অবান্তর। ভারতীয়রা কী চায় না চায় সেইটেই বড়ো কথা। ভারতীয়দের অধিকাংশ চায় অবিভক্ত ভারত। কিন্তু আরেক অংশ পণ করেছে কিছুতেই হিন্দুদের আধিপত্য বা প্রাধান্য স্বীকার করবে না। দেশকে দুভাগ করে একটা ভাগের উপর মুসলিম আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে। তার জন্যে যদি দরকার হয় গৃহযুদ্ধে নামবে। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে তৃতীয় পক্ষেরই মধ্যস্থতা চাই। তৃতীয় পক্ষ যতই ন্যায়-নিষ্ঠ হোক না কেন, কোনো পক্ষের দাবি পুরোপুরি মনজুর করবে না, করতে পারে না। এটা এথিকাল প্রশ্ন নয় যে একপক্ষে ন্যায়, অপর পক্ষে অন্যায়। এটা পলি-টিকাল প্রশ্ন। অনুরূপ প্রশ্নে জার্মানি একদা দুভাগ হয়েছে। জারমানি আর অস্ট্রিয়া। নেদারল্যান্ড একদা দুভাগ হয়েছে। হল্যান্ড আর বেলজিয়াম। আয়ারল্যান্ডও এই শতাব্দীতেই দুভাগ হল। আইরিশ ফ্রী স্টেট আর উত্তর আয়ারল্যান্ড। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টানট তো একই ত্রাণকর্তার উপাসক। তাদের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য? হিন্দু আর মুসলমান তাদের তুলনায় অনেক বেশি পৃথক। এই পার্থক্যের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবেই। ইংরেজ থাকতেও যা, না থাকতেও তাই। এটাই আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। ইংরেজরা যদি না আসত এইরকম হত। ইনডিয়ান ইউনিট ইজ আ লস্ট কজ। আমরা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতে পারি, কিন্তু মারামারি করতে গেলে ব্যর্থ হব। বৃথা রক্তক্ষয়। তেমনি একতরফা সত্যাগ্রহ আর আত্মবলিও বৃথা। শহীদ হতে হলে এই ইস্যুতে নয়। অন্য কোনো ইস্যুতে। যার একদিকে ন্যায়, অপর দিকে অন্যায়। তার সময় পরে হয়তো আসবে।" স্বপনদা প্রত্যয় নিয়ে বলেন।

"কী যে বল, স্বপনদা!" মানস স্থির থাকতে পারে না। "তুমি কি ডিফিটিস্ট? মুসলিম লীগের কাছে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে? ওরা কি সব মুসল-মানের প্রতিনিধি? তার প্রমাণ কী? সামনের সাধারণ নির্বাচনে জিততে পারবে? পাঠানরা ওদের দিকে নয়, পানজাবের ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা ওদের দিকে নয়, বাঙলার কৃষক-প্রজা মুসলমানরা ওদের দিকে নয়। অথচ ইংরেজরা ধরে নিচ্ছে যে সব মুসলমান ওদের দিকে। এটা ইংরেজদের অন্ধতা। ইচ্ছাকৃত অন্ধতা। নেলসনের মতো কানা চোখে টেলিস্কোপ লাগানো। রোয়েদাদ কখনো নয়। দরকার হলে লড়তে হবে। হিংসা অহিংসা উভয়েরই আশ্রয় নিতে হবে। ফাইট ইট আউট।"

"আমিও বলি, রোয়েদাদ কক্ষনো নয়। কিন্তু আমি এটাও বলি, হিংসা কক্ষনো নয়। লড়তে যদি হয় তবে সেটা অহিংস পদ্ধতিতে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত নই। ইংরেজদের সঙ্গেও না। লীগপন্থী মুসলমানদের সঙ্গেও না। আমরা মিটমাটের জন্যেই প্রাণপণ করব। যতদিন পারি গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখব। বেধে গেলে মাঝখানে দাঁড়াব। ফলাফল আমা-দের হাতে নয়। ভগবানের হাতে।" সৌম্য চোখ বুজে ধ্যান করে।

"তার আগে তোমাদের ক্ষমতার মায়া কাটাতে হবে। ইংরেজদের সর্বাস্তিকরণে বলতে হবে যে কংগ্রেস ক্ষমতা চায় না। ওরা যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাক। নয়তো শূন্যতা সৃষ্টি করে যাক। তার পর যার ইচ্ছে সে ক্ষমতা দখল করুক। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। যেটা সম্ভব-পর সেটা হচ্ছে এক-একটা প্রদেশের ভার এক-একটা দলকে দিয়ে যাওয়া। তখন গড়ে উঠবে কংগ্রেসের একটা ফেডারেশন, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য মুসলিম দলের একটা ফেডারেশন, রাজন্যদের একটা ফেডারেশন। পরে হয়তো সকলের সম্মতি নিয়ে কনফেডারেশন গড়ে উঠবে। কিন্তু কোথাও সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নি, হয়ে থাকলে হয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। এদেশে তার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যতদূর দৃষ্টি যায়, ইংরেজ চলে গেলে ঐক্যও চলে যাবে। ইন-ডিয়ান ইউনিট ইজ আ লস্ট কজ। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, এফেকট তেমনি কজকে টানে। সব নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছোটে, সব কারণ তেমনি বিচ্ছেদের দিকে। গান্ধীজী যদি বিচ্ছেদকে মিলনে রূপান্তরিত করতে পারেন তা হলেই ইংরেজ চলে গেলেও ঐক্য বজায় থাকবে। সে আশা আমি রাখি নে। তবে এখনো বিশ্বাস করি যে ভারত ভেঙে গেলেও বাঙলা ভেঙে যাবে না। ইনডিয়ান ইউনিট ইজ আ লস্ট কজ, বাট বেঙ্গলি ইউনিট ইজ নট ইয়েট। কিন্তু কে জানে, সেটাও হয়তো লস্ট কজ। ট্র্যাজেডির ওপর ট্র্যাজেডি।" স্বপনদার কণ্ঠে বিষাদ।

"তুমি আর-একটি ক্যাসানড্রা।" মানস জ্বলে ওঠে। "কেবল ট্র্যাজেডির ভবিষ্যদ্বাণী করতেই জান। তুমি ডিটারমিনিস্ট, ডিফিটিস্ট, পেসিমিস্ট। তোমাকে হিউ-মানিস্ট বলে মনে হয় না। হিউমানিস্ট হলে তুমি বলতে

ভারতের ঐক্য বহুশতকের বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের মুখ মধ্যযুগের দিকে ঘুরতে পারে না। মুসলিম লীগ বাগড়া দিতে পারে, টোরি পার্টি বাধা দিতে পারে, কিন্তু বিবর্তনসূত্রে যে ঐক্য এসেছে সেটা ইংরেজ বিদায়ের পরেও আপনার পথ আপনি করে নেবে। গৃহযুদ্ধ অসম্ভব নয়, কিন্তু গৃহযুদ্ধে লিঙ্কনেরই জয় হয়, জেফারসন ডেভিসের নয়। এদেশেও নেহরুরই জয় হবে, জিন্নার নয়। বাপুর নাম করছি নে, তিনি তো যুদ্ধ-বিরোধী। লড়তে হবে নেহরুকেই। কিন্তু হবেই বা কেন গৃহযুদ্ধ? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি যদি নেহরুকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, বাপু যেমন করেছেন। নইলে যেটা হবে সেটা ওয়ার অভ সাকসেশন। কংগ্রেস গোড়ায় বিফল হলেও আখেরে সফল হবে।" মানসের ভবিষ্যদ্বাণী।

"না, ভাই, আমরা যারা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরোধী তারা কখনো গৃহযুদ্ধ বা উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমর্থন করতে পারি নে। তবে অহিংস সংগ্রাম আমরা করতে পারি, যদি উপায়ান্তর না থাকে। কিন্তু সেটা বিদেশী শাসকদের সঙ্গেই, স্বদেশবাসী মুসলমান ভাই-দের সঙ্গে নয়। জিন্না সাহেব আমাদেরই এক ভাই, তাঁর অনুগামীরাও আমাদের কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি ভাই। অজুনের মতো আমাদেরও দোটানা। সংগ্রাম করব, না করব না? অহিংস সংগ্রামও ক্রমে হিংসার বদলে প্রতিহিংসায় পথভ্রষ্ট হতে পারে। অনায়াসেই পরিণত হতে পারে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হবেই, আর সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হলে মিলন হবে কী করে? বিচ্ছেদই তো তার অনিবার্য পরিণাম। আমরাই ডেকে আনব পার্টিশন। ভারতেরও, বাঙলারও। একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না। ঐক্য যাবেই, ঐক্য গেলে স্বাধীনতাও আসবে না। ঐক্য আর স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইংরেজরাই থেকে যাবে। যেতে চাইলেও চারদিক থেকে রব উঠবে, 'তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী।' না, অরাজকতার সামনে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের নেই। জাপানি আক্রমণের মুখে যেটা মন্দের ভালো ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মুখে সেটা মন্দ।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

ওদিকে দীপিকাদির কফির আসরে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মিলি বলছিল জুলিকে, "এই একটা

বদ অভ্যাস ওদেশে গিয়ে আমি পেয়েছি, কিন্তু আর সবই সদ অভ্যাস। অমন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন আমাদের এদেশে কোথায়? আমরা না জানি ঠিক সময়ে খেতে, না কি-চাকরকে বিরাম দিতে, না বাইরে গিয়ে বাজার করতে, না নিজেরাই বয়ে আনতে। অথচ মুখে বিপ্লবের বুলি। কাজের সময় কাজ, আড্ডার সময় আড্ডা। কাজে ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে ওরা জানে না। কাজের সময় মুখ বুজে কাজ করে যায়, বড়ো জোর একটু আবহাওয়া নিয়ে মন্তব্য করে। আর আমরা? গল্প করতে পারলে আর কিছু চাই নে। যাক, ওসব বলে তোকে বোর করতে চাই নে। তুই নিজেও তো ওদেশে ছিলি। তোকে নতুন কথা আর শোনাব কী? হ্যাঁ, একটা কথা সত্যি শোনাবার মতো। যুদ্ধকালে ইংরেজদের যে সংঘবদ্ধতা, যে ডিসিপ্লিন, যে আদেশ বা নির্দেশ মেনে চলা, যে কর্তব্যজ্ঞান, তার তুলনা আমাদের দেশে কোথায়? আমরা সবাই রাজা, কেউ কারো অধীনে কাজ করব না। দল ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। নীতিগত কারণে নয়। সেটা একটা মুখোশ। কারণটা ব্যক্তিগত। ইংরেজরা যে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বা বেশি সাহসী তা আমি মানব না। কিন্তু তারা জানে কেমন করে বিপদকালে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে কর্তব্য করতে হয়। ওদের অগ্নিপরীক্ষার প্রহরে আমি ওদের দেখেছি। যাকে বলে ইংলন্ডের ফাইনেস্ট আওয়ার। যখন নাৎসিরা আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে লন্ডন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। একজনও ভয় পায় নি, পালায় নি। নাৎসিদের মার খেয়ে অটল থেকেছে বা অকাতরে মরেছে। নাৎসিরা ভেবেছিল ফ্রান্সের মতো ইংলন্ডকেও কাবু করবে। জানত না চার্চিল কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সেই সঙ্গে কৌশলী। মামার দেশ আমেরিকাকে নামিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধে, তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। যা কেউ কখনো পারত না—সোভিয়েট রাশিয়াকেও করেছেন ক্যাপিটালিস্ট ইংলন্ডের মিতা। ইংরেজরা যে জিতে গেল তার অর্ধেক কারণ তো তাদের ডিপ্লোমেসি। বাকিটা তাদের মনোবল। যাকে বলে মরাল। ছ বছর ধরে আমি সব দেখে-শুনে যা শিখেছি তা হাজার পুঁথি পড়ে শেখা যেত না। না রে, ডিগ্রী আমি পাই নি। ছেলের মা হয়ে পড়াশুনায় মন দেব কী করে? রণই আমার ডিগ্রী।"

জুলি পরিহাস করে বলে, "তোর আর আশা নেই, মিলি। ঝাঁসীর রানী হওয়া আর ভাগ্যে নেই। রানীর তো সন্তান ছিল না। হ্যাঁ, ছিল। তার নাম ঝাঁসী। ফাইনেস্ট আওয়ার ভারতেরও আসবে। বিদ্রোহী সিপাহিরা তোর দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

মিলি পালটা দেয়। "তোরও আশা নেই, জুলি। জোন অভ আর্ক হওয়া তোর অদৃষ্টে নেই। তার বদলে হবি কস্তুরবা গান্ধী। সিপাই বিদ্রোহের দিন তোর কোনো ভূমিকা থাকবে না। ইংরেজরা তোকে ভুলেও ধরবে না, পোড়ানো দূরে থাক। তবে জনতা তোকে দেবী বলে ভক্তি করবে।"

দীপিকাদি ওদের মাঝখানে না বসলে ওরা হয়তো হাতাহাতি করত। তিনি রণকে আদর করতে-করতে বলেন, "ততদিনে রণ বড়ো হয়ে থাকবে। ওই সিপাইদের পরিচালনা করবে। সিপাই বিদ্রোহের ঢের দেরি আছে, মিলি আর জুলি। তার আগে হিন্দু-মুসলমানের এক-জোট হওয়া চাই। তার লক্ষণ কই?"

"সত্যি বলেছেন, বউদি। এ সমস্যা তো ইংলন্ডে ছিল না। থাকলে ওরাও একজোট হত কি না সন্দেহ। নেতাজী সুভাষ জাপানের যুদ্ধবন্দীদের একজোট করতে পেরেছিলেন, সেটা কিন্তু ভারতের বাইরে। দেশে ফিরে এসে তারা আবার বিভক্ত হয়ে গেছে। কতক চলে গেছে মুসলিম লীগ শিবিরে। লড়লে তারা লড়বে ইংরেজের সঙ্গে নয়। হিন্দুর সঙ্গে। ভারতের আজাদির জন্যে নয়, পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। লক্ষণ শুভ নয়।" মিলি আফসোস করে।

"আমি, ভাই, সিপাই বিদ্রোহের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মারসিনারি। যার নিমক খায় তার বিরুদ্ধে লড়বে না, লড়লে ওই চার্চিল-টার্চিল একটা কোনো অরাজনৈতিক ইস্যুতে লড়বে। আমি নির্ভর করি জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদ্রোহের উপরে। তবে তার জন্যেও চাই দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি। হাতিয়ার হাতে নয়, শুধু হাতে। এমন কোনো ইস্যুতে লড়তে হবে যেটা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের কাছে জীবনমরণের ব্যাপার। সেটা ঠিক এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। বাপু আমাদের নেতৃত্ব করে এসেছেন, তিনিই নেতৃত্ব করবেন। তাঁকে তো আমরা আরো পঁচিশ বছর পাচ্ছি। তিনি একশো বছর বয়স অবধি বাঁচবেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনের মতো একটা ইস্যু পাওয়া যাবে নিশ্চয়। আমরা

অপেক্ষা করব। ক্ষমতার জন্যে যাঁরা লোলুপ তাঁরাই আপসের কথা ভাবছেন। আর আপসের সম্ভাবনা দেখা দিলেই জিন্না তার সুযোগ নেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন। কংগ্রেস কিছু পেলে তো লীগও কিছু পাবে। হিন্দুস্থান বলে একটা রাষ্ট্র হলে তো পাকিস্তান বলেও একটা রাষ্ট্রও হবে। কিন্তু হিন্দুস্থান হতে দেব না আমরা। পার্টিশন হতে দেবই না। আমরা কট্টর জাতীয়তাবাদী।" জুলি উদ্দীপ্ত স্বরে বলে।

"ঘটনা তোদের জন্যে অপেক্ষা করবে না, জুলি। অ্যাটলি চার্চিল নন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে, তাই নিয়ে কথাবার্তা চালাতে চান। তা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে চার্চিল শেষমুহূর্তে জিন্নার মুখ চেয়ে কাঁচিয়ে দিতে পারেন। তখন আমাদের লড়াই না করে উপায় থাকবে না। আর সে লড়াই তোদের বাপুর খাতিরে অহিংস হবে না। কিন্তু আমার বোধহয় ঝাঁসীর রানী হওয়া চলবে না। রণ কবে বড়ো হবে, ততদিন কি লড়াই বন্ধ থাকবে?" মিলি গালে হাত দিয়ে বসে।

"এবার রোজা লুকসেমবুর্গ কী বলেন শোনা যাক।"

দীপিকাদি বাবলীর দিকে তাকান। বাবলীর কোলে এল্‌ফ ছিল। তার দিকেও।

এল্‌ফের মুখে একখানা ক্র্যাকার ধরিয়ে দিয়ে বাবলী বলে, "ও কী, বউদি, আপনিও পরিহাস শুরু করলেন? কার সঙ্গে কার তুলনা! আমি কি রোজা লুকসেমবুর্গের মতো অসাধারণ মনস্বিনী নারী! তবে আজকের ভারতে আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে। আমরাও জনগণের মধ্যে সক্রিয়। দেশ যতদিন না সত্যিকার বিপ্লবের জন্যে তৈরি হয়েছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্যে নয়, ততদিন আমরা মার্ক টাইম করব। তার মানে ছোটখাটো সংগ্রামের পায়চারি। এই যেমন তেভাগা আন্দোলন। আমাকে যে-কোনোদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। গ্রেপ্তার যদি না করে তবে আমার ঠিকানা অনির্দিষ্ট। এটা ঠিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় বলে অনেক কটু কথা শুনতে হবে। মিলি আর জুলি আমাকে দেশদ্রোহীও বলতে পারে। কিন্তু আপনি যেন বিশ্বাস করেন যে আমাদের লক্ষ্য সত্যিকার বিপ্লব।"

[ক্রমশ

মহাজীবনের স্বপ্ন

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

এখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
দেখি, আকাশে অনুরাধার ছলচ্ছল হীরকাশ্রু,
নীচে চিকন নদীর উথলে-ওঠা বুকের মধ্যে
ভয়ংকরী বাঁকা নদীর পরীর মতো শরীরের
ঢেউয়ের চূড়ায় শ্রাবণের সজল পূর্ণিমা
আমাকে নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

চোখ খুললেই দেখি অদৃশ্য গাছ,
হাজার অট্টালিকায় স্মৃতির রাজপথ,
পাহাড়ের ধারে রডোডেনড্রনের বাহারে
লাস্যময়ী একগুচ্ছ পাহাড়ী মেয়ে
শহরের সকল কিশোরীর চেয়ে সুন্দর,
যেন ফুলদানিতে প্রোথিত রক্তগোলাপের তোড়া।
যখন হিমালয়ের সব চূড়াই বরফে-ঢাকা
দেখি, বৈকাল হ্রদের বিহ্বল বনহংসী
ভারতীয় উষ্ণতর হ্রদের দিকে উড়তে-উড়তে
আমার তরুণমূর্তিকে অবাক হয়ে দেখছে।

কবে, কখন আমিও দেখেছিলাম
জয়দেবের মেলায় তরুণী বাউলের নাচ,
মায়ার সাগরে দেবদাসীর উদাসী হাসি,
অলকানন্দায় বিদেশিনী বৈষ্ণবীর বিবাগী বেদনা,
কন্যাকুমারীতে সিংহলী নাচের মুদ্রা,
কত গুহা, রেখাচিত্র, ভাস্কর্য ও গান,
কত সভা, সম্মান ও কবিতার বিচিত্র সম্ভারে
বিশ শতকের পৃথিবীকে ভেবেছিলাম একান্ত আমার।

আমার আন্তর্জাতিক সত্তার এই ভাবরোমাঞ্চ
এখন বুদ্ধি ছেড়ে বোধির দিকে প্রসারিত,
পৃথিবীর ধ্বংস এবং মৃত্যুর সামনে
যুদ্ধ এবং অস্থিরতার মাঝখানে
এখন নিত্য এবং শাশ্বতের দিকে ধাবমান
আমার বোধির জায়মান কিরণধারা।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
আমার বিশ্বরূপকে অন্যভাবে দেখি,
চিকন নদীর উথলে-ওঠা বুকের সামনে
নবজীবনের মহৎ স্বপ্নে সঞ্জীবিত
আমার রূপান্তরের মধ্যে অমৃতের স্বাদে
জীবন থেকে মহৎ জীবনে
বেদনাস্বরূপ থেকে আনন্দস্বরূপে
আমি থেকে পরম আমিতে উত্তরণের
কালাতীত শোভা!

কৈশোরের ঘরবাড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর কিনারে ছিল মাটির-মমতা-মাখা
কৈশোরের বাড়ি
একই লম্বে বাঁশবাগান, বেগুনে-লঙ্কার কুচো খেত
পবিত্র শূন্যতা ছিল চারদিকে, কিছু কিছু ঘাস ফুল ছিল
রাত্রির বাড়িটি ছিল দিনের বাড়ির বহুদূরে
কখনো অদৃশ্য, ফের চাঁদের উদ্যোগে ভাসমান
কিসের সৌরভ যেন ঘুরে যায় সন্ধেবেলা,
ঠিক যে-সময়ে নদী ডাকে
আকাশ-বাঁধানো তীর, সন্ন্যাসীর মতো এক নদী
কোথায় যে যাবে বলে বেরিয়েছে, নিজেই জানে না।

কৈশোরের মাঠকোঠায় ছিল না একটুও সোনা,
ইস্পাত, বারুদ
সদা রূপকথা ভেঙে জেগে উঠছে মন-কেমন-করা
এক দেশ
পিছনে অস্পষ্ট ধ্বনি, মেঘছেঁড়া চকিতের ছবি
গ্রীষ্মের হাওয়ায় ভাসে জামরুলফুলের মিহি কণা
যেন মোহময় মিথ্যে
একা-একা জল নিয়ে খেলা
লম্বা গাছটির ডালে এক-একদিন এসে বসে
অবাক অবাক-চোখে প্যাঁচা
মৃদু বৃষ্টি, শব্দের জোয়ারে তার ভ্রূক্ষেপ নেই
অজস্র সুতোর জাল বাতাস ছড়িয়ে যায় বাতাসের মনে
ধিকধিকে খিদের মতো সব দিকে প্রতীক্ষার
তীব্র ব্যাকুলতা
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে মা যাচ্ছেন কাঁচা রান্নাঘরে
কুপির আলোয় কাঁপে ছোট্ট একটি সংসারের ছায়া
আবার মিলিয়ে যায়, ঝড় ওঠে বড়ো প্রিয় ধ্বংসের
আওয়াজে
আচমকা ঘুম ভেঙে শোনা যায় রুদ্র সন্ন্যাসীর মিহি ডাক।

কৈশোরের ঘরবাড়ি নদীর কিনারে আজো
রয়ে গেছে.....

নজরুল-সংগীত

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অনেক দিন পরে রেডিয়োতে নজরুলের গান শুনলাম। নাম
যাঁদের যাঁদের ছিল, তাঁদের মধ্যে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফিরোজা বেগম, অনুপ ঘোষাল,
এই তিনজনের গান শুনে মাঝে-মাঝে তুড়ি দিচ্ছিলাম, আর বুঝতে চাইছিলাম
নজরুল এত জনপ্রিয় কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে। গাছে গাছে
আলটপকা হাওয়ার মতন শিহরণ। সমস্ত হৃদয়-মন
হয়তো ভরে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ফেনা-ওঠা সমুদ্রের ডাকও শোনা যায়।
প্রথমে মহম্মদ রফির গান ছিল, তখন রেডিয়ো খুলি নি। হয়তো
ভালোই গেয়েছেন। কিন্তু মানবেন্দ্রর ধ্রুপদাঙ্গ-মেশানো গলার
পাশে, ফিরোজার চিকন পাখির মতো স্বর, আর অনুপ ঘোষালের
অভিমান-মেশানো গলার ছলাকলা অদ্ভুত পৃথিবী যেন খুলে দিয়ে
ব্যাপ্ত করে দিল। নিল কি আমাকে জয় করে? হয়তো। হয়তো নয়।
অনেকটা সময় শুধু বিদ্রোহী কবির টানা-টানা ভাসন্ত চোখের
স্মৃতি মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল তাঁর প্রেম, ত্যাগ, বিষণ্ণ অসুখী
বুক, কার বুক অশ্রুবারিতে ভেসে যায়? কে কোথায় ডাকে, কোন্‌দিকের
ফিকে হয়ে আসে যেন অন্ধকার। বারবার একই বাঁশি শুনে
শ্রীমতী রাধিকা তবু নতুন-নতুন ভাবে সাড়াশব্দ দিতেন। তাই না কি?
প্রেম কি নিদেন শুধু সম্ভোগ। হয়তো প্রথমে তাই, কিন্তু তারপরে
যেন ফেরে পড়তেন নজরুল ইসলাম। আর গান, শুধু গান, শুধু গান।
বন্ধ-ঘরে হারমোনিয়ম কাছে নিয়ে নজরুল এখন গাইছেন, মুখে জরদা-পান।

কাবিলনামহ্ থেকে বসুধারা : অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে

গৌরী আইয়ুব

এই প্রবন্ধের শুরুতেই কবি আল মাহমুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি সম্প্রতি একটি অভিমান ব্যক্ত করেছিলেন—যার থেকে আমার এই বক্তব্যের উদ্ভব।

আল মাহমুদ কয়েক দিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন। এক বন্ধুগৃহে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। কবিকে নিজের কবিতা পাঠ করতে অনুরোধ করলাম আমরা। তিনি তাঁর 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা পাঠ করলেন। তারপর সখেদে বললেন, কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি কাব্যপাঠের আসরে এই গ্রন্থেরই একটি কবিতা পাঠ করার পর এক শ্রোতা প্রশ্ন করেন 'কাবিন' শব্দটির অর্থ কী? এই প্রশ্নে আল মাহমুদ বিস্মিত হন। "শত শত বৎসর ধরে পাশাপাশি বাস করার পরেও মুসলমানের এমন একটি সর্বদা-ব্যবহৃত ঘরোয়া শব্দ হিন্দুর কাছে এত অপরিচিত ঠেকে কেন? অথচ আমরা তো হিন্দু-সংস্কৃতির সবই জানি। কত কঠিন সংস্কৃত শব্দও আমরা অহরহ ব্যবহার করছি। তাহলে আরবি ফারসি শব্দ হিন্দুরা এত কম বোঝেন কেন?" প্রতিবেশী মুসলমানের প্রতি বাঙালি হিন্দুর মনে কোনো সশ্রদ্ধ কৌতূহল নেই এবং তাঁরা অনুৎসুক বলেই তাঁদের এমন অজ্ঞতা—এই ছিল আল মাহমুদের অনতিব্যক্ত অভিমান।

এক্ষেত্রে তাঁর এই অভিমানটা যে সম্পূর্ণত সংগত নয়, সেটা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই আমিও তাঁকে পালটা জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি 'বসুধারা' শব্দটির অর্থ জানেন?" হঠাৎ এই প্রশ্ন করায় উনি সামান্য একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "কেন?...হ্যাঁ জানি তো...পৃথিবী।" 'বসুধা' কিংবা 'বসুন্ধরা'-র সঙ্গে 'বসুধারা'-র ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকায় ওঁর বোধহয় এটুকু ভ্রম ঘটেছিল।

আল মাহমুদের মতন শব্দসচেতন কবির যে এই শব্দটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় নেই তার প্রধান কারণ, হিন্দুসমাজের যেসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই শব্দটি, সেই অনুষ্ঠানগুলিই তাঁর অজানা। অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি শুভকাজের সূচনাতেই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে একটি আভ্যুদয়িক বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার রীতি আছে। সেই সময়ে প্রাচীরগাত্রে যে কয়েকটি ঘৃতের ধারা ঢালা হয়, সেগুলিই বসুধারা। পুরুষানুক্রমে যে-গৃহ-প্রাচীর বসুধারা-চিহ্নিত, তার প্রতি হিন্দুর মনে যে একটু সশ্রদ্ধ দুর্বলতা আছে এটা বোধহয় খুব কম মুসলমানই জানেন।

তেমনি কজন হিন্দুই বা জানেন যে মুসলিম বিবাহের বিধি অনুযায়ী বর আর কন্যাকে একটি চুক্তি-পত্রে সম্মতি দিতে হয়? তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করছেন, স্বামী স্ত্রীকে কত দেন-মোহর দিতে অঙ্গীকার করলেন ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত থাকে। বিবাহে একজন 'উকিল' আর কয়েকজন সাক্ষীও উপস্থিত থাকেন। তাঁরাও এই চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিবাহের এই চুক্তিপত্রটিকে 'কাবিন-নামহ্' বা সংক্ষেপে 'কাবিন্' বলা হয়ে থাকে। দাম্পত্যের পবিত্রমধুর সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত বলে এই শব্দটি মুসলমানের মনে যে মাধুর্য আর পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে আছে, তাও অধিকাংশ হিন্দু জানেন না। তাই কোনো কাব্য-গ্রন্থের 'সোনালী কাবিন' নামকরণের রোম্যান্টিক দ্যোতনা এই-বাঙলার অনেক পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এতদিন তো হিন্দুর বিবাহে অনুরূপ কোনো লিখিত চুক্তি ছিলই না। কিছুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজেও বিবাহ রেজিসট্রি করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। তবু এখনও অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় শালগ্রামশিলা আর অগ্নিকে সাক্ষী মেনে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে। মন্ত্রগুলিতে কোনো অবোধ্য ম্যাজিক নেই, বরং কিছু মিলিত প্রার্থনা আছে। যেমন :

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব
যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম ইত্যাদি।

[আমার এই হৃদয় তোমার হোক। তোমার এই হৃদয় আমার হোক।]

আবহমানকাল ধরে যেহেতু হিন্দুবিবাহ মন্ত্রপূত (স্যাক্রামেনটাল) তাই চুক্তিবদ্ধ (কনট্র্যাকচুয়াল) বিবাহের কোনো ধারণাই এখানে অনেকের নেই। এবং মুসলিম বিবাহ যে ঠিক কিভাবে সম্পন্ন হয়, এ ব্যাপারে বহু হিন্দু আজও অজ্ঞ।

এই অজ্ঞতার কারণও সবারই জানা। প্রতিবেশী দুই সমাজ পরস্পরের অনুষ্ঠানে এতকাল অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন। হিন্দুদের দিক থেকেই স্পর্শদোষ বাঁচাবার তাগিদে দেওয়ালটা আগে তোলা হয়েছিল, পরবর্তী কালে জেদের বশে মুসলমানও নিজের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক নাগরিক মানুষদের জীবনে এই গোঁড়ামি আর সংকীর্ণ-তার ধার অনেকটা ক্ষয়ে গেছে বটে, তবু আজও যে দু-চার জন ভাগ্যবান পরস্পরের উৎসব-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ অথবা দাওয়াত পান, তাঁরাও ক্বচিৎ অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তাই এখনও পরস্পরের অনুষ্ঠান-গুলির সঙ্গে ভালোমতন পরিচয়ই ঘটে নি। ফলে আনুষ্ঠানিক শব্দগুলিও অপরিচিত রয়ে গেছে। ব্যাপারটা দুঃখের, কিন্তু একতরফা অভিযোগের নয়।

এবার 'কাবিন' বা 'কাবিননামহ্' শব্দ দুটি নিয়েও একটু কথা আছে। আমার স্বামীর পরিবারে শুনেছি বলে এগুলি আমার কাছে অপরিচিত নয়। তবু আল মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হবার পরেই বাড়ি ফিরে 'চলন্তিকা' দেখলাম। 'কাবিন' অনুপস্থিত। তারপর একে একে দেখা গেল শুধু রাজশেখর বসু নয়, সুবল মিত্র এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'কাবিল' পর্যন্ত পৌঁছে তবে 'কাবু' হয়েছেন বটে, কিন্তু মধ্যপথে 'কাবিন' বাদ পড়ে গেছে। তখন বাঙালি হিন্দু এ শব্দটি জানেন না ধরেই নিয়ে আমার মুসলমান আত্মীয়-বন্ধুদের একে একে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম এই শব্দটি তাঁরা জানেন কিনা। মুসলিম ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন একজন বন্ধু—তিনি চব্বিশ পরগনার অধিবাসী—বললেন শব্দটি আদৌ 'কাবিন' নয়। শব্দটি 'কাবিল'। তাঁর উরদু-ভাষিণী শ্বশ্রুমাতার মত উল্লেখ করে জানালেন যে এই 'কাবিল' শব্দটি 'কবুল' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বরকন্যা বিবাহের সময় কিছু শর্তসাপেক্ষে এই পবিত্র সম্পর্ককে 'কবুল' করেন, তাই এই চুক্তিপত্রকে 'কাবিল' বা 'কাবিলনামহ' বলা হয়। আমার বড়ো জাও উরদুভাষিণী (এবং বাঙলাভাষিণীও বটেন)। তিনি একটু সংকোচ করে বললেন, তাঁর ধারণা শব্দটি কাবিন, এবং আরবি হরফে আমাকে 'কাবিননামহ্' লিখে দেখালেন। খুঁজে-পেতে তাঁর ষাট বছরের পুরোনো কাবিননামহ্‌টিও দেখালেন, কিন্তু তাতে কোথাও ওই শব্দটি লেখা ছিল না। এর পর ক্রমাগত উলটোপালটা সাক্ষ্য পেতে থাকলাম। কলকাতার উরদুভাষিণী এক তরুণী বললেন, তাঁরা চিরকাল 'কাবিল' শব্দটিই শুনে এসেছেন। আমার উত্তরপ্রদেশীয়া এক ছাত্রী বললেন, তাঁরা 'কাবিন' বা 'কাবিল' কোনোটিই ব্যবহার করেন না,

তাঁরা ঐ চুক্তিপত্রকে 'নিকাহ্‌নামহ্‌' বলেন। যাই হোক, অবশেষে আরবিতে এম এ-পাস-করা এক স্নেহাস্পদ শ্রীমান উরদু অভিধানের সাহায্যে নিষ্পত্তি করে দিলেন এই সমস্যার। শব্দটি অবশ্যই 'কাবিন'—এর অর্থ ইকরার বা স্বীকার করা। 'কাবিন্‌নামহ্‌'-এর অর্থ যে বিবাহের চুক্তিপত্র অভিধানে তাও পাওয়া গেল। এদিকে পশ্চিম-বাঙলার মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া, তারকেশ্বরবাসী কয়েক জনের কাছে জানা গেল যে তাঁদের পারিবারিক শব্দাবলীতে এ শব্দ দুটির কোনোটিই নেই। এমনকি, লিখিত চুক্তির রেওয়াজও নেই কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে। সেখানে মুখে-মুখেই সাক্ষী আর উকিল সব বলা-কওয়া করে নেন, এবং উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনরা শুনে মনে রাখেন! তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাঙলাভাষী এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের শুধু হিন্দুরা নন, মুসলমানেরাও অনেকে 'কাবিন' শব্দটির সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন। এই তথ্য আল মাহমুদ সাহেবের অভিমানকে আরো উদ্দীপিত করবে, না প্রশমিত—তা ঠিক অনুমান করতে পারছি না।

তবু একই-ভাষাভাষী এই দুই ধর্মীয় সমাজের দূরত্বটা ভাবনার বিষয় অবশ্যই। বাঙালি মুসলমানের মুখের আর সাহিত্যের ভাষায় হিন্দুরা কখনও কখনও হোঁচট খান একথা সত্য। এটা ইচ্ছাকৃত ন্যাকামি নয়। সম্ভবত পশ্চিম-বাঙলার মুখের ভাষাও একই রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে মাঝে-মাঝে পূর্ব-বাঙালির কানে। শুধু তাই নয়, বাঙালি মুসলমানের মানসিকতার সঙ্গেও হিন্দুর পরিচয় যথেষ্ট নয়। তাই একই ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার মূল্যায়নে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের যখন আসমান-জমিন ফারাক ঘটে যায়, তখন এঁরা খুব অবাক হন। অল্প কাল আগে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা আমার এক সহকর্মিণী একটু বিচলিত হয়ে এসে আমাকে বললেন যে তাঁর ক্লাসের একটি মুসলিম ছাত্রী দ্বিজেন্দ্রলালের ঔরঙ্গজীব-চরিত্র চিত্রায়নে বিশেষ আপত্তি করেছে। আমার সহকর্মিণী নাকি তাঁর ছাত্রীকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি যে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রিয় হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই নাটক লিখেছেন। আমিও আমার সহকর্মিণীকে ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারি নি যে হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে ঔরঙ্গজীব-চরিত্র যেমন দেখায়, ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণের সেটাই একমাত্র পরিপ্রেক্ষিত নয়।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মানসিক দূরত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—এই এক প্রজন্মকাল পশ্চিম-বাঙলার মানুষ পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি অনীহ ছিলেন। সামান্য কয়েকজন সম্মানিত ব্যতিক্রম ছিলেন অবশ্য। কলকাতা, বলতে গেলে সম্পূর্ণতই, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঢাকার দিক থেকে! অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম-বাঙলা সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব ছিল না এবং নানা বাধা সত্ত্বেও এদিককার বইপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা সেখানে অব্যাহত ছিল। পশ্চিম-বাঙলার ফিল্ম এবং নাটক নিয়েও গভীর আগ্রহ আর উদ্দীপনা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর জনজাগরণ এবং তারপর বাংলাদেশের জন্ম স্বভাবতই পশ্চিমবাঙলায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল এবং একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা ছিল যে দুই বাঙলা বুঝি এক হয়ে গেল। সেই উদ্দীপনা আর আগ্রহ আবার ধীরে ধীরে শীতল হয়ে এসেছে, যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক দূরত্ব কিছুই কমে নি। তবু বাঙলাদেশ-ই যে বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যার স্বীকৃত ভাষা বাঙলা, এতে পশ্চিম-বাঙলার বাঙালির বাঙালিরা যুগপৎ গর্ব আর ঈর্ষাবোধ না করে পারেন না। রাজনৈতিক সীমান্তকে অতিক্রম করে আমাদের ভাষাগত বন্ধন যে বাঙলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, এ সত্য যত আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, ততই ওই-বাঙলার মানুষের ভাষা আর মন বুঝবার তাগিদ প্রবল হবে এদিকে। আরো একটি কথাও ভুলে থাকা উচিত নয়। পূর্ব-বাঙলার তুলনায় পশ্চিম-বাঙলার মুসলমান এখনও যতই মূক আর পশ্চাৎপদ হোন, এঁরাও সংখ্যায় এই-বাঙলার এক-চতুর্থাংশ। এঁদের চিন্তাভাবনা প্রত্যয় আর বেদনার জগতেও হিন্দুর প্রবেশ বিলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ইংরেজ রাজত্বের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠার আগে বাঙলার গ্রামীণ সমাজে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক দূরত্বের চেহারাটা বাস্তবিক কেমন ছিল, হিন্দুর মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল পাঠের আসরে মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিল কিনা, মুসলমানের পুঁথিসাহিত্য হিন্দুর ঘরে ঘরে সাদরে গৃহীত হয়েছিল অথবা হয় নি, দুই সমাজের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভাষায় কতটুকু পার্থক্য ছিল, সমসময়ে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিকাশ মোটামুটি

একই পর্যায়ের ছিল কিনা—ইত্যাদি বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও আপাতত উহ্য থাক। শুধু মনে রাখা যাক যে, কলকাতার নগরকেন্দ্রিক বাঙলা সাহিত্য আর সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দু সমাজের আধিপত্য ছিল। কারণ এ যুগে সংস্কৃতির ধারক আর বাহক যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ তার উদ্ভব আর প্রতিষ্ঠা বাঙালি হিন্দুর মধ্যে যখন বেশ ভালোরকম হয়ে গেছে, তখনও মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দেখা নেই। ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণটা হিন্দুরই-নবজাগরণ। রামমোহনের ধর্মভাবনায় ইসলামের প্রভাব কিংবা দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের প্রকাশে হাফিজের উপস্থিতি ইত্যাদি অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, আরো দূর পশ্চিমের অভিঘাত অনেক বেশি প্রবল হওয়ার ফলেই বোধহয় নবজাগ্রত আধুনিক হিন্দুমানসে মুসলমান আর মুসলিম সংস্কৃতির উপস্থিতি প্রান্তিক। উলটো দিকে, এই জাগরণকে রেনেসাঁস বলা সংগত কিনা, এ প্রশ্ন অবশ্য অন্য অনেকেও করেছেন, তবে প্রায় সব বাঙালি মুসলমানের চোখেই এই জাগরণ হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় বলেই ঠেকেছে। কাজি আবদুল ওদুদের মতন মুক্তবুদ্ধি মানুষ এই নবজাগরণের সঙ্গে ওয়াহাবি আন্দোলনের মিল পেয়েছেন কিছু। দুই ক্ষেত্রেই বিজিত হৃতগৌরব জাতি নিজের নিজের প্রাচীন ধর্ম আর সংস্কৃতির শিকড়ে ফিরে গিয়ে তার বিশুদ্ধ রূপটি পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণকে শুধু এই লক্ষণে চিহ্নিত করলে যে সুবিচার করা হয় না, তা আজ হয়তো অহিন্দু বুদ্ধিজীবীরাও কেউ কেউ স্বীকার করবেন। ওদুদ সাহেব তাঁর ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল-এ লিখেছেন,

Of the front-rank leaders after Rammohun, Debendranath, Keshabchandra, Ramkrishna, Vivekananda and Rabindranath were frankly of religious disposition.

একনিঃশ্বাসে একবাক্যে এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি?

যাই হোক, হিন্দু সমাজের রেনেসাঁস অথবা রিভাইভালের সমকালে প্রতিবেশী মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন এবং আত্মানুসন্ধান চলছিল তার ইতিহাস পাশাপাশি না রাখলে বাঙালি সমাজের সমগ্র চিত্রটা পাওয়া যায় না। ওয়াহাবি এবং পরবর্তী খিলাফত আন্দোলনের ইতিহাস সুবিদিত, কারণ সেগুলি সামাজিক বিস্ফোরণ। কিন্তু আভ্যন্তরিক নানা বিপরীতমুখী শক্তির টানাপোড়েনে দিকভ্রান্ত এবং কচ্ছপের মত নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া মুসলিম সমাজ, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ সে সময়ে করতে পারে নি। তবে সেই যে নীলদর্পণ-খ্যাত পাদরি লং সাহেব, তিনি ১৮৬৯ সালেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে "মুসলিম সমাজ মরে যায় নি, নিদ্রায় (আত্মবিস্মৃতিতে?) আচ্ছন্ন হয়ে আছে।" তাই সমসাময়িক হিন্দু সমাজ যদি আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজের দিকে নজর না দিয়ে থাকে, তবে ব্যাপারটা তখন হয়তো অস্বাভাবিক হয় নি। কিন্তু সেদিন মুসলিম সমাজের ভিতরে ভিতরে কোথায় রক্তক্ষরণ হয়ে তাকে অবসন্ন করে রেখেছিল তা আজকের দিনে স্পষ্ট করে জানার প্রয়োজন আছে।

ড. রফিউদ্দীন আহমেদের মতে, এই আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটতে শুরু করে ১৮৭২ সালের প্রথম আদমসুমারির পর। এতকাল যে-বাঙলাদেশকে প্রধানত হিন্দু-অধ্যুষিত বলে মনে করা হত, হঠাৎ এই জনগণনার ফলে দেখা গেল, তার শতকরা ৪৮ জন অধিবাসীই মুসলমান। হুগলির পূর্বে আর দক্ষিণে কোনো কোনো জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬০ ভাগ ছিল তখন। আর বগুড়া, রাজশাহী আর পাবনায় ৭০ ভাগেরও বেশি। এই বিরাট জনসংখ্যার অতিবৃহৎ অংশ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী বলেই কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। তা ছাড়া বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়ে সেদিন একটা স্ববিরোধ, একটা আত্মখণ্ডন ছিল। তার নির্মোহ চিত্র ইদানীং বাঙলাদেশের আধুনিক তথ্যনিষ্ঠ আত্মানুসন্ধানী বহু গবেষক স্পষ্ট করে তুলছেন।

কিন্তু ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় আবিষ্কারের যে যন্ত্রণা, সেটা বাঙালি হিন্দু এখনও ঠিকমতন উপলব্ধি করেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্রাহ্ম হওয়ায় নিজেও এই যন্ত্রণার শিকার হয়ে ছিলেন। তাই এই সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা তাঁকেও করতে হয়েছে। ১৯১২ সালে তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে বর্তমান কালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্ম সমাজে একটা তর্ক উঠি-

য়াছে।" এই তর্কের উত্তরে তাঁর বক্তব্য : "আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীত কাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্যলক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

"এরূপ কখনও সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই : সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।"

ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে তিনি 'সমাজ' আখ্যা দিতেই অনিচ্ছুক। যেহেতু ধর্মকে পরিবর্তন করা যায়, তাই ধর্মগত পরিচয় নাকি 'নিত্যলক্ষণ' নয়, সেটা সাম্প্রদায়িক এবং পরিবর্তন-সাপেক্ষ পরিচয়। আবার 'হিন্দু' শব্দটি তাঁর কাছে কেবলমাত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম নয়। আসমুদ্রহিমাচল এই উপমহাদেশীয় ভূখণ্ডের অধিবাসীমাত্রই হিন্দু। তাঁর এই সমাধান তাঁরই ভাষায় উপস্থিত করি : "পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া?

"তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই, কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন...। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাঙলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছেন, হিন্দুরা অহর্নিশি তাঁহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাঁহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ —কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে, তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত, অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।"

রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গ্রহণ করা যদি-বা সহজ এবং অসচেতনভাবে হয়তো বা অনেকখানি গৃহীত হয়েছে বলেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় ইতিমধ্যেই হিন্দুসমাজে পুনর্বিলীন হতে চলেছেন, কিন্তু মুসলিম আর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বেলায় ব্যাপারটা তত সহজসাধ্য নয়। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পক্ষে হিন্দু সমাজের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা স্থাপন কঠিন হয় নি, কারণ "শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও...বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে।" ফলে, হিন্দুসমাজসমুদ্রে ব্রাহ্ম-জলস্তম্ভের উত্থান এবং পুনর্বিলয় একশো দেড়শো বছরেই ঘটতে চলেছে। তুলনায় হিন্দুর উপাসনাবিধি, দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইসলামকে, এমনকি বাঙলাদেশেও, ততখানি স্পর্শ করে নি। তাই সাতশো আটশো বছরেও ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় যে হিন্দু সমাজে বিলীন হবেন, তার কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শুদ্ধি-আন্দোলনেও খুব ফল ফলবে, এমন আশা কম! এমনকি সেই 'নিত্য পরিচয়' দিতে একজন ব্রাহ্মর যতখানি মানসিক প্রতিরোধ রয়েছে, একজন মুসলমানের তার চেয়ে অনেক বেশি থাকাই সংগত।

তবু 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি আমাদের সব সম্প্রদায়েরই প্রণিধানযোগ্য : "যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না : নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় একথা কখনো শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পথে না হলেও 'নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু" থেকে বাঙালি মুসলমান কিভাবে নিজের আত্মনির্বাসন ঠেকিয়েছেন সেই ইতিহাস স্মরণে রাখা ভালো। বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানের এই জাগরণও যথাযোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। এই জাগরণ এবং আত্মপরিচয় আবিষ্কারের ইতিহাস একটি বিরাট সমাজের সংশয়জীর্ণ দ্বিধাবিভক্ত সত্তার সুস্থ সংহত সত্তায় প্রত্যাবর্তনের যন্ত্রণাময় কিন্তু জয়যুক্ত ইতিহাস।

সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম সমাজ ভিতরের আর বাহিরের সমস্যাগুলিকে কিভাবে দেখেছিলেন, বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁদের মুখ থেকেই শোনা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থ থেকে অনেকখানি উদ্ধার করে দিলাম। তা না করে নীরক্ত একটি সারাংশ দেওয়া যেত। কিন্তু বহু পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন ব্যক্তির এই সম্পাদকীয় এবং মন্তব্যগুলি একে তো প্রামাণিক দলিল, তার উপর আবার এমন আবেগসংরক্ত যে তার রসগ্রহণ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা করল না। উদ্ধৃতিগুলি পুনর্বিন্যাস করার সময় মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমপরিণতিকে ধরবার চেষ্টা করেছি। একদিকে তখন তাঁরা ইংরেজ শাসকশ্রেণীর সন্দেহের পাত্র, সুতরাং কৃপানুগ্রহ-বঞ্চিত। অন্যদিকে, সরকারী কৃপাপুষ্ট উন্নতিশীল হিন্দু সমাজের তাঁরা অবজ্ঞার পাত্র। অবস্থাটা খুব সুখের নয়। তাই প্রতিক্রিয়াও অনেক সময়েই বেশ তিক্ত :

"ইংরেজকে দেবতার জাতি ও ফেরেশতার সমাজ বলিয়া আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও স্বার্থের দাস।"

"ইংরাজ আমাদের উন্নয়নকার্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাঁহার ভেদনীতিই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। ইংরাজের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ পার্থক্যের রেখা—তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ হিন্দু মুসলমান হইতে বহু দূরে—তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে আজ প্রীতির অভাব ঘটিয়াছে।...ইংরাজ ভারতে নানা কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের পুরুষগৌরব বজায় রাখিয়া তিনি যদি আমাদের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা লাভ করিতেন।"

"...মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, তাঁহারা রাজভক্ত না হইয়া পারেন না। মুসলমানের ধর্মে আঘাত না পড়িলে তাহারা কদাচ রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় না। সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি যে-সকল ঘটনায় মুসলমানগণ রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, সে সমস্তই ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।"

"বর্তমান সময়ে মোসলমানগণের ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের সমকক্ষ হওয়াই একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা অন্য জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাহাদের ধন, মান, প্রাণ এমনকি ধর্ম সর্বস্বত্ব কলুষ-কালিমাময় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ...ধর্মগত কর্তব্য পালন করিতে আপনারা সর্বদাই বাধ্য এবং রাজার আইন ও খোদার আইন পালন করা প্রত্যেক মোসলমানের ধর্মগত কর্তব্য।"

"মুসলমান রাজত্বের দিনে হিন্দু যে আমাদের করুণার ভিখারী হইয়া গৌরবান্বিত হইত, আজ কি তাহা তাহাদের স্মরণ হইতেছে না ; আজ হিন্দু আমাদিগকে কেন ঘৃণা করে?...হিন্দু যদি বুঝিতে পারে, মুসলমান তাহাদের নিকট-আত্মীয় এবং প্রতিবাসী ; অনেক দিন তাহারা মুসলমানের নিমক খাইয়াছে, তবেই তাহার স্বদেশদ্রোহিতা ঘুচিবে।"

"কিন্তু পরিতাপের—শুধু পরিতাপের কেন, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, কতিপয় উন্নতমনা ব্যক্তি ব্যতীত, হিন্দুমাত্রেই সাধারণত মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা নহে—বরং ইহা প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত সত্য কথা। সেইহেতু এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয় যে সত্যই কি মুসলমান এত ঘৃণার পাত্র?"

"বাংলাদেশের হিন্দুভ্রাতারা মোসলমানদিগের মনে যত প্রকার উপায়ে নীচ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'মোসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ' এই কথাটি সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এই সাংঘাতিক বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী বীর আরব, ইরাণী, তুর্কী এবং পাঠানের সন্তানেরাও আপনাদিগকে চিরদাস, চিরনগণ্য, অর্ধসভ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ বলিয়া প্রাণের ভিতরে কোনও প্রকার জাতীয় গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্বের উদ্বোধন করে না। এই হীন ধারণা যতদিন পর্যন্ত দূরীভূত না হইবে, সে পর্যন্ত আমাদের ছাত্র ও যুবকদিগের মনে উচ্চ ধারণা ও প্রভুত্ব পরাক্রমের কল্পনার কিছুতেই সঞ্চার হইবে না।"

"আর বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের কি অবস্থা? আমাদের মধ্যেও অধুনা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দুগণের তুলনায় সে সংখ্যা মহার্ণবের সহিত গোষ্পদের তুলনার ন্যায় নিতান্তই তুচ্ছ।...আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দুরবস্থার চিত্র এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা চক্ষুহীন লোককেও অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় না।"

"একবার চিন্তা করিয়া দেখ—শক্তির অভাবে, আমরা কেমন অপদার্থ জড়রূপে পরিণত হইয়াছি। এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনো মুসলমান-শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই। অথচ এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পোঁছিয়াছে।"

"হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'কুলীন' আছেন, মুসলমান-দিগের মধ্যেও সেইরূপ 'শরীফ' আছেন। আজকাল বঙ্গ-দেশের অনেক স্থলে এইরূপ শরীফদের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে।...এই-সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ কৌলিন্যমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নীচশ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষকশ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করিতে 'বিবাহের পণ' দাবী করিয়া বসেন।...ত্রিশ চল্লিশ টাকা হইতে দুশ পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ের বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।"

"বাঙ্গালার মুসলমানের অধঃপতনের যতগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে 'আশরাফ-আতরাফ' প্রভেদজ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়া চলিয়াছে, আর তার পরিণাম ফলে সমাজ আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

"এই দেশের মাটিতেই যে-সকল মুসলমান পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে সেই পরিবারসমূহের অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি ধী-মান, শিক্ষিত, স্বধর্মপরায়ণ ও মার্জিতরুচি হন, তবে তাঁহারা কোন্ হিসাবে আশরাফের নিকট খাটো হইবেন? শরাফতের ইসলামসম্মত যে সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার মধ্যে যাঁরা পড়িবেন তাঁহারাই আশরাফ, আর সকলে আতরাফ।"

"বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক ধর্মগ্রন্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ধর্মগ্রন্থের অভাব বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অভাবই বলিতে হইবে।"

"...সমাজ বর্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীরসাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ সমাজের উন্নতিকে অন্যূন আরো কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছেন।"

"ভারতে—বিশেষ করে বাঙ্গালায় মোল্লাদের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতা সকলের মনেই একটা বিশ্রী অসন্তোষের ভাব ক্রমে জাগিয়ে তুলছে।...সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের দিকে যে যথেষ্ট কাজ করছে, তা এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বলা বাহুল্য, মোল্লারা অন্ধের মত কালা-কাল বিবেচনা না করে, এই বিকাশের পথও আটকিয়ে রেখেছেন! মোট কথা, এঁদের কার্যকলাপ, হাবভাব পরিষ্কার করে জগৎকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ইসলাম (?) মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহিত পা ফেলে চলবার মোটেই উপযুক্ত নয়। এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়?"

"...'আরব হামারা, চীন হামারা, হামারা হিন্দুস্তান'—মুসলিম কবি প্যানইসলামিজমের তারিফ বয়ান করতে গিয়ে ভাবে তন্ময় হয়েছেন। যাঁরা কল্পলোকে বাস করেন, তাঁদের কানে এ গানের সুর ভালোই লাগে। কিন্তু জগতের ইতিহাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে।...এমনি করেই জাতীয়তার দাবী সকল যুগে ধর্মের বাঁধন শিথিল করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজিকার দিনে ক্রুসেড ও জেহাদের পুনরভিনয় সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"বাঙালি সমাজ ধর্মের নামে বড়াই করতে গিয়ে জাতীয়তার দাবীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। ইসলাম যে একটি ধর্ম, জাতি নয় একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বাঙালি মুসলিম—তাঁরা জাতিতে মুসলমান একথাটাই জোর গলায় প্রচার করছেন। তাঁরা 'নেশন' ও 'রিলিজনের' একই অর্থ করে বসেছেন।...আর আজ সহস্র বৎসর বাংলার জলবায়ুতে পুষ্ট মুসলিম সমাজ বাংলাদেশে একঘরে হয়ে আছেন। বাংলা দেশ আজও এঁদের ধাইমা। তাই জাতি জন্মের কথা উঠলে এঁরা বাংলার বাইরে দৃষ্টিপাত করেন।"

"আরবীয় মোছলমানের গৌরব যেমন চীন ও ভারতের মোছলমানের ভোগ্য ও প্রাপ্য, ভারত ও চীনের মোছলমানের গৌরবও তেমনি আরবীয় মোছলমানের প্রাপ্য ও ভোগ্য।...বস্তুত তাহারা ভাবের রাজ্যে, ধর্মের রাজ্যে, কর্তব্য ও কর্মের রাজ্যে পরস্পর এক। শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ, সমস্ত জগতের মোছলমানগণও তেমনি একত্র সম্বন্ধযুক্ত।"

"...এই নেশন বা জাতি সম্বন্ধে মুছলমানের আদর্শ স্বতন্ত্র।...মুছলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্মগত। বিশ্বের সকল মুছলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি।...মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্বনাশ হইবে। এই আরবী ভাষাই বিশ্বমুছলমানের মিলনের একমাত্র অবলম্বন।"

"আরবী ও উর্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।...শ্রেয়কে প্রেয়ের উপরে স্থান দিতেই হইবে।"

"শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ন্যূনাধিক উর্দু শিক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি।...উর্দু ভারতের সাধারণ ও ভাবী রাজভাষা হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও এই আকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা কি মুসলমানের পক্ষে অনিবার্য নহে?"...

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আরব পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা এদেশে আসিয়াছি ; সুতরাং বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা আরবী পারসী না হইলেও নিশ্চয়ই উর্দু।"

"কোন্ গুণে উর্দু আমাদের বরেণ্য? ভারতের অর্ধেকের বেশি মোসলমান কথা বলেন বাংলায়, আর অবশিষ্ট বলেন বিভিন্ন ভাষায়। তথাপি বাঙালি মোসলমানকে উর্দু ধরিতে হইবে, আচ্ছা জবরদস্তি বটে!"

"দুনিয়াতে অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালি?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। মুসলমান যেদিন হইতে বঙ্গজননীকে নিজের মাতৃরূপে বরণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সংবাদপত্রে আলোচনা বা সাহিত্য সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে বঙ্গভাষাকে তাহারা আপনার মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

"এদেশে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব আর বঙ্গভাষার উৎকর্ষ—ইতিহাসের একই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মুসলমান বঙ্গভাষাকে নিজের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহারাই যে বঙ্গভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দিতেছে।"

"বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"

"ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানী ভাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।"

"বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর যখন স্বহস্তে বঙ্গভাষার অঙ্গে বেশভূষা পরাইয়া দিতেছিলেন, তিনি 'বাদশার' 'দরবারে' 'মেজর' 'বন্দোবস্ত' না করিয়া 'রাজাধিরাজ চক্রবর্তীর রাজসভায়' 'উচ্চ কাষ্ঠ মঞ্চের' 'আয়োজন' দ্বারা বঙ্গভাষার কোমল বাল্যপদে কঠিন লৌহশৃঙ্খল পরাইয়াছিলেন।"

"বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে আমাদের চলিবে না। আধুনিক বঙ্গভাষা হিন্দু-ভাবাপন্ন ইহা সত্য, কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? মুসলমানের ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতাই কি তাহার হেতু নহে?"

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতারূপে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে মোছলমান সাহিত্যের গতি অর্ধপথে সহসা স্থগিত হইয়া যাইত না।"

"আজকাল ইংরাজী, ফার্সী, আরবী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার যে-সকল শব্দ বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও একদিন অচল ছিল। অভাবে পড়িয়াই হউক, ভাষার সৌষ্ঠব ও শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই হউক, আর ঐ-সকল ভাষার প্রবল প্রতাপে অভিভূত হইয়াই হউক—যাহা একদিন চলিত ছিল না, আজ তাহা বহু পরিমানে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে বাংলা ভাষার উপকারই হইয়াছে।"...

"বাঙ্গলা ভাষাতেও আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব হিন্দুর অপেক্ষা কম না হইয়া বেশি হইবে।...বাঙ্গলা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার উদরে জন্ম গ্রহণ করিলেও, মোছলমানই তাহাকে আদর করিয়া রাজসিংহাসনের পার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু মাতা তাহাকে লেংটি বা ধুতি পরাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মোছলমান আসিয়াই তাহার লেংটি খুলিয়া আচকান পাজামা, চোগা ও টুপিতে তাহাকে শাহজাদা করিয়া তুলিয়াছিলেন।...আমরা প্রয়োজন অনুসারে যেমন দীর্ঘসন্ধিসমাসবহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিব, তেমনি দরকারবশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।"...

"কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম-নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারাণ, নারাণ মধু যদু চুণীরাম পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিৎ চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না।..."

"বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথমে মোছলেম-হিংসার সূত্রপাত হয়।"

"আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখীন, একের সহিত অন্যের যোগ তো নাই-ই বরং পরস্পর দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছে। ইহা বড় ভাল কথা নহে।...প্রিয় মুসলমান লেখকগণ!...হিন্দু সমাজের কোন কোন লেখক তোমাদের প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতি কোন কুধারণা পোষণ করিও না। যেমন তাঁহাদের কেহ কেহ তোমাদের বেদনা দিয়াছেন, সেইরূপ অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আবার একান্ত আপনার ন্যায় তোমাদের মনের কালিমাও মুছিয়া দিতেছেন।"

যে চৌত্রিশ জন খ্যাত অখ্যাত নাতিখ্যাত ব্যক্তির মত উদ্ধৃত হল, তাঁদের নাম বা পত্রিকার নাম উল্লেখ করি নি, কারণ আপাতত এই অভিমতগুলিতেই আমার প্রয়োজন। কোনো কোনো অভিমত কোনো পাঠকের অ-বাস্তব বলে যদি মনে হয় তবু মনে রাখা দরকার যে 'বাস্তব'টার এই চেহারাই ধরা পড়েছিল সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো মানুষের মনে। কারণটা যথার্থ বা সংগত হোক না হোক, মানসিক প্রতিক্রিয়াটা এরকমই হয়েছিল। এবং এই প্রতিক্রিয়ার যতটুকু সামাজিক মূল্য সে তাকে দিতেই হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কিংবা বিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-

চিত্র গ্রন্থগুলি একেদশদর্শী। কারণ, বাঙালি মুসলমানের জীবনপরিচিতি এবং মানসভাবনা ওইসব গ্রন্থে স্থান পায় নি। পূর্বসূরীদের এই অনারব্ধ কর্মটি সম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক নূরউল ইসলাম, মুসলমানের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' সংকলন করে দিয়ে। আমার আশঙ্কা, এই গ্রন্থটি সাত-আট বছর আগে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আমারই মতন আরো অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এখানে। সেইজন্যেই এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি, তবু তা এই গ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

এই স্বল্প সাক্ষ্য থেকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের আসল সমস্যাগুলি বেশ ধরা যাচ্ছে। একটি বিশ্বজনীন ধর্মের গৌরব, সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বেদনা, মাতৃভাষার প্রতি সহজাত মমতা আর আঞ্চলিক যে সংস্কৃতি ধমনীতে বহমান তার মাধ্যাকর্ষণ—এই চতুষ্কোণ টানাপোড়েনে সেদিনের বাঙালি মুসলমানকে ছিন্নভিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল। আর তার মধ্যে রাজনীতি এসে প্রবেশ করে এই সাংস্কৃতিক সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানকেও জটিল করে তুলেছিল। অবশেষে ভারত ভাগ করেও বাঙালি মুসলমান তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি। অগত্যা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এবং সেই সঙ্গে চলেছে বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠা। তাই বলে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে সম্পূর্ণ পরাভূত, তা সম্ভবত নয়।

এই বাঙালিত্বের ধারণা এবং বাস্তব রূপ দুই বাঙলায় যে ঠিক একই রকম হবে, এটা প্রত্যাশা করা সংগত নয়। এইভাবে একই ভাষার দুই দেশে সমান্তরাল বিকাশের শ্রেষ্ঠ নজির ইংরাজি সাহিত্য। বনেদি ইংলন্ডে এবং হঠাৎ-নবাব এমেরিকায় ইংরাজি ভাষা আর সাহিত্য ভিন্ন পথে গিয়েও, অথবা গিয়েই, পরস্পরের সম্পূরক। তারই পুনরাবৃত্তি চলবে জারমান সাহিত্যে এবং বাঙলা সাহিত্যেও। দুই বাঙলার মানুষকেই মেনে নিতে হবে যে ভাষা আর সাহিত্যের মূল কাঠামোয় মিল থাকলেও দুই বাঙলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই দুই দেশের ভাষা আর সাহিত্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্যও থাকবে। কোনোদিক থেকেই এই পার্থক্যকে কৃত্রিম এবং সে কারণেই বর্জনীয় জ্ঞান করা ঠিক হবে না।

এই নৈকট্য আর দূরত্ব দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে প্রেম-অপ্রেমের চিরন্তন 'দ্বন্দ্ব' (উভয়ার্থে) বাধিয়ে রেখেছে তারই বার বার প্রতিফলন হবে সাহিত্যে এবং আলাপচারিতেও। বাঙলা ভাষার বিকাশে যদি মুসলিম অনুকূল্য বেশি লাভ হয়ে থাকে, সাহিত্যের বিকাশে হিন্দুর প্রাধান্য এখন পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় না। অতএব ভাষার আর সাহিত্যের আদৌ যদি কোনো 'স্বত্ব-স্বামীত্ব' থাকে তবে সেটা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভাগ না করে নিয়ে গত্যন্তর নেই। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সামান্য-লক্ষণ এই-যে মাতৃভাষা, এই ভাষাই দুই বাঙলার মানুষের 'নিত্যলক্ষণ'। তাঁদের আসল পরিচয়, তাঁরা বাঙালি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানের মনে একটা উপেক্ষিত হবার অভিমান আছে। হিন্দুর সাহিত্যে মুসলমান সুবিচার পান নি এই দুঃখ যেমন বদ্ধমূল অধিকাংশ মুসলমানের মনে, তেমনি হিন্দুর রচিত বিরাট বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র, মুসলমানের জীবনযাত্রা, মুসলমানের ভাবনাবেদনা অতিক্ষুদ্র স্থান পেয়েছে, এও এক স্থায়ী মনঃক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাপারটা বোধহয় খুবই স্বাভাবিক। যে সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, যার ভাবনাবেদনায় যথেষ্ট প্রবেশ করেন নি লেখক, তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাওয়া বিপজ্জনক। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে হতে পারে। যদিও কবি গোলাম মোস্তফা বলেছিলেন, "বাংলা ভাষায় কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই...বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও আমরা ইসলাম-বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই।" তবু অন্য কেউ যে খুঁজে পান নি তা কিন্তু নয়। 'দুরাশা' গল্পের বাদশাহ্‌জাদা বদ্রাওন-কুমারীকে স্মরণ করুন। এই কাহিনীর জন্য 'নবনূর' পত্রিকায় জনৈক সমালোচক বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন, "রবিবাবুর এই কল্পনায় মুসলমান সমাজ খুবই সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বঙ্গের প্রিয় কবির তো এই কীর্তি, সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ!" অতএব বোঝা যাচ্ছে, কারুরই সততা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

অন্য লেখকের কথা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাই আবার বলি। বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যেও মুসলমানের উপস্থিতি এতই সামান্য বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, তাঁদের কাছে তথ্য হিসাবে পেশ করি যে তাঁর প্রথম যুগের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের এবং অধিকাংশ গল্পের মুখ্য চরিত্র-গুলি ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই এটা অব্রাহ্মণের প্রতি সচেতন উপেক্ষা নয়। তাঁর শোভনলাল (বৈদ্যসন্তান)-লাবণ্য দত্ত-এলা দাশগুপ্তরা এসেছেন একেবারে শেষের দিকে। প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম চতুরঙ্গের জ্যাঠা-মশাই, আর শচীশ—তাঁরা জাতিতে স্বর্ণবণিক। রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম চরিত্ররাও ব্রাহ্মণ। 'অতিথি' গল্পের 'ব্রাহ্মণ বালক' সম্বন্ধে নামের পাশে ঐ অভিধাটিও বারবার সস্নেহে প্রযুক্ত হয়েছে এই কাহিনীতে। এটাই সম্ভবত স্বাভাবিক, কারণ ব্রাহ্মণ-পরিবারের আচার-আচরণের সঙ্গেই ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'পদ্মনদীর মাঝি' লেখা সম্ভব ছিল না, শরৎচন্দ্রের পক্ষেও না। যাঁদের ঘরকন্না, চিন্তাভাবনা কিংবা সুখদুঃখের সঙ্গে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, শুধু কল্পনার সাহায্যে তাঁদের জগতে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। কল্পনার দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে যায়। তখন অনধিকারচর্চার অপরাধে বিড়ম্বিত হতে হয়।

বাঙলা সাহিত্যের এই অভাব ঘোচাবার যথার্থ ক্ষমতা এবং অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরাই এবার এগিয়ে আসছেন। নূতন ভাব, নূতন ভাষা, নূতন মানুষ আর নূতন সমাজচিত্র আমাদের একঘেয়েমি দূর করবে অনেকটা। বাংলাদেশের সাহিত্যকর্মকে অস্বীকার করবার বা সে বিষয়ে অনুৎসুক থাকবার আর উপায় নেই আমাদের। শিল্পসাহিত্যের সত্যিকারের জোর থাকলে নিজের আসন সে কেড়ে নেবেই। ওই-বাঙলার কবিতা আর গবেষণাপ্রসূত রচনা ইতিমধ্যেই এখানে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ভাষা আর সংস্কৃতির দূরত্ব অনতিক্রম্য কোনো বাধা নয়। এই-বাঙলাতেও গত যুগের অসচেতন ত্রুটি সংশোধন করতে সচেতন প্রয়াসে যখন 'প্রেম নেই' লেখা হয় তখন পাঠকের আগ্রহ পূর্বোক্ত বাধাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

নবাবি আমলে এবং তারপরেও বেশ কিছুকাল পারসি ভাষার চর্চা করেছেন হিন্দুরা। শুধু রাজদ্বারে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই যে হিন্দু এই ভাষার ব্যবহার করেছেন, তা তো নয়। সাহিত্যের অন্তঃপুরেও আরবি পারসি শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটেছিল স্বাভাবিক-ভাবেই, পরবর্তী কালে যেমন ইংরাজির ঘটেছে। মুসলিম সমাজের অভিযোগ যে বাঙলা ভাষার এই স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও বলেছেন, "জাতীয়তাবাদ আর হিন্দুজাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হল সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার।" এই হিন্দু নবজাগরণের ফলেই হিন্দুরা সচেতন প্রয়াসে বাঙলা ভাষা থেকে আরবি পারসি শব্দ বর্জন করেছেন, যেমন কিনা কাশীর পণ্ডিতরা হিন্দি ভাষার শুদ্ধিকরণ করেছেন সচল আরবি পারসি শব্দের জায়গায় অপ্রচল সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট করিয়ে। হিন্দি আর হিন্দুস্তানি ভাষার সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এখনও চলছে এবং রাষ্ট্রানুকূল্য সত্ত্বেও হিন্দিকে হিন্দুস্তানি ভাষার কাছে যে অনেকখানি ভূমিত্যাগ করতে হবে, তা এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সযত্নে-সংস্কার-করা হিন্দি কৃত্রিম এবং সেজন্যই এর প্রাণশক্তি তুলনায় কম। হিন্দুস্তানি মাটির অনেক কাছাকাছি বলেই অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর সুখশ্রাব্য, অতএব এর অনেকখানি জীবনীশক্তি আছে—একথাও স্বীকার করতে হয়।

বাঙলা ভাষার দুই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার পিছনেও যে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধিকরণের মনোভাব প্রবল ছিল, এই মতটি সম্পূর্ণ মেনে নিতে আমার মন রাজি হয় না। বিশেষত এই ব্যাপারে যাঁকে প্রধান আসামি মনে করা হয়ে থাকে সেই বিদ্যাসাগর তো শুদ্ধিকামী 'হিন্দু' পণ্ডিত ছিলেন না। বেনারস সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের সঙ্গে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের যে মৌলিক পার্থক্য ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, তাতে কি হিন্দু পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত হচ্ছিল? এমনকি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যে শাখা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনবিমুখ দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে তাকে ঠেকাবার জন্যও শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে তিনি লড়াই করেছিলেন। সেই ব্যালেন-টাইন-বিদ্যাসাগর বিতর্কের ঈশ্বরচন্দ্রই যে ভাষাবিষয়ে 'শুদ্ধি'প্রয়াসী হয়ে আরবি-পারসি বর্জন করেছিলেন—এই অভিযোগটা মেনে নিতেও আমার অসুবিধা হয়।

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী বাঙলা গদ্যের একটি নূতন শৈলী তিনি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন যা নিত্যব্যবহৃত ভাষা থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। এই সাধু বাঙলা কৃত্রিম অবশ্যই। কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহার্য যে 'স্বাভাবিক' ভাষা, তা দিয়ে তো তখন তাঁর প্রয়োজন মিটছিল না। জনসাধারণের কথিত

ভাষার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করতে গিয়েই আরবি-ফারসির সঙ্গেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন কথিত ভাষাকে আধুনিক চিন্তন-মনন এবং নাগরিক সাহিত্য-সৃজনের ভাষায় উন্নীত করতে গিয়ে যদি এই ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করাটাই তিনি উচিত বিচার করে থাকেন তবে তাতে কিছু ভ্রান্তি দর্শানো হয়তো যায়, কিন্তু তাকে সাম্প্রদায়িক-অসূয়া-প্রসূত মনে করলে অন্যায় হয়। "বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতারূপে গঠিত না করিতেন তাহা হইলে মোছলমান সাহিত্যের গতি অর্ধপথে সহসা স্থগিত হইয়া যাইত না"—একটি জটিল সাংস্কৃতিক সমস্যার এটি একটি অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা। আজকের দিনের আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশী সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীদের এ-জাতীয় ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয় বলে বিশ্বাস করি না। সেকালেও মীর মোশাররফ হোসেন বা কায়কোবাদ এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেন নি।

শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা এবং ফলত মুখের ভাষাও যে ক্রমেই সংস্কৃত-নির্ভর হয়ে গেল এবং আরবি পারসি ভাষার ব্যবহার সংকুচিত হতে থাকল, হিন্দুর পুনর্জাগরণই এর একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ নয়। নব শিক্ষাব্যবস্থা বোধহয় আরো বড়ো কারণ। তা ছাড়া, শিক্ষিত মহলে আরবি-পারসির কদর আগেও তো রাজানুকূলেই ঘটেছে। রাজাবদলের সঙ্গে-সঙ্গে যদি তার অবমূল্যায়নও ঘটে থাকে, তবে সেটাও কি খুব অস্বাভাবিক? রাজন্বারে ইংরেজি যত বেশি গুহীত হতে থাকল আরবি-পারসিও সেই পরিমাণে স্থানচ্যুত হল। আবার লোকসাহিত্যের এবং সাধারণের ভাষার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের ভাষার যতই দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকল সর্বদাব্যবহৃত আরবি পারসি শব্দের সঙ্গেও তেমনি দূরত্ব সৃষ্টি হল। দীনেশ সেন মশাই ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে, "বর্তমান কালে গোঁড়া হিন্দুরা দিবারাত্র যে-সকল উর্দু কি ফারসি শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন লেখনীমুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। এইরূপে 'হজম' স্থলে 'পরিপাক' বা 'জীর্ণ', 'খাজনা' স্থলে 'রাজস্ব', 'ইজ্জৎ' স্থলে 'সম্মান' ...ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন।" কিন্তু বর্জনের তালিকায় কি কেবল আরবি পারসি শব্দই আছে? তদ্ভব শব্দ নেই? চলিত ক্রিয়াপদ নেই? এই গোঁড়ামিটা নাগরিক আভিজাত্যের গোঁড়ামি, শিক্ষিতের উন্নাসিকতা। জিহ্বাগ্রের ক্রিয়াপদ 'খাচ্ছি' যেমন করে লেখনীমুখে 'খাইতেছি' হয়ে যেত, তেমনি করেই 'জমি' 'ভূমিতে', 'খেসারৎ' 'ক্ষতিপূরণে' "উন্নীত" হয়ে যেত। একটা বিশেষ কালে একেই সভ্যভব্য ভাষার রীতি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। আমরাও অল্পবয়সে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে যে তিরস্কার লাভ করতাম সেটা তাঁদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির জন্য তো নয়, ভব্যতার সীমা লঙ্ঘনের জন্যই। তেমনি মুখের ভাষার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে স্বল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করলে যে 'আভিজাত্যে'র বোধ হত তার পিছনে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার চেয়েও সামাজিক শ্রেণীভেদের মানসিকতা বোধহয় প্রবলতর ছিল। সবুজপত্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যখন চলিত ভাষা গ্রহণ করলেন তখন তাঁর ভাষাকে 'পিরালী' ভাষা বলে নিন্দিত করেছিলেন যিনি তিনিও একজন মুসলিম সাহিত্যিক।

যাই হোক, জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যও স্পাইরালের গতিতে এগিয়ে চলে, প্রায় একই জায়গায় ফিরে এসেও একটু উপরে থাকে। আজকের দিনে তেমন ছুৎমার্গী লেখক আর কজন আছেন যাঁদের 'পানি' স্পর্শ করলেই জাত যায়, কিংবা যাঁরা মান থাকতে 'জল'-স্পর্শ করবেন না? আজকের দিনে কোনো হিন্দুলেখক হয়তো অবনীন্দ্রনাথের মতন সহজ আনন্দে লিখতে পারবেন না, "শুন গুলমুর্গা ফুল বনের বনমোরগ, ফজিরে উঠি, খেলাই রুটি, পালকমুঠি চুজারে রোজ-ব-রোজ।" কিন্তু এই যে শিবনারায়ণ রায় 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব : বাংলা দেশ থেকে ফিরে' লিখেছিলেন তাতে 'দেশ'-এর অধিকাংশ পাঠকের কাছে 'শাহাদাৎ', 'বেগানা' 'সরহদ্দ' ইত্যাদি শব্দ একটু অপরিচিত ঠেকলেও নিশ্চয়ই প্রসঙ্গ থেকে অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি। এখানে আরবি-পারসির ধারা শুকিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু উরদু ও হিন্দুস্তানির প্রবল ধারা পশ্চিম-বাঙলার বাঙালিকেও অভিভূত করছে বোম্বাই ফিল্ম, মুশায়রা, গজল ইত্যাদির মারফত। একটু সবুর করুন, এখানেও ক্রমে ক্রমে কাবিননামহ্, হেদায়ৎ, নাজায়েজ, খুতবা, মৌলুদ তবলীগ ইত্যাদি শব্দ আর-একবার শিখে নেবেন হিন্দু পাঠকেরা। এতে অস্থির হলে চলবে কেন? ধীরে বন্ধু, ধীরে।

সংকট-বিহার

শওকত ওসমান

পরস্পরবিরোধী দুই সামাজিক শক্তি বা প্রবণতা যখন হেস্তনেস্ত মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখনই সংকটের সূত্রপাত হয়। মানুষ, ঘটনা, পরিস্থিতি—নানা উপাদান পেছনে থাকে। ফলে সংকটের তালিকা করা দায়। সেইজন্যে প্রধান কোনো একটি উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং সেইভাবে সংকটের নামকরণ ঘটে। যথা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক সংকট, পারিবারিক সংকট ইত্যাদি।

হাল আমলে নৈতিক সংকটের একটা বড়ো উদাহরণ : উৎকোচ বা ঘুষ। দেশী-বিদেশী বহু সমাজচিন্তাবিদ তথা অর্থনীতিবিদ অনুন্নত দেশে এই ব্যাধির উল্লেখ করে থাকেন। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুন্নার মির্দাল একাধিক বার বলেছেন যে দুর্নীতি থেকে সূত্রপাত স্বৈরাচারের। অনুন্নত দেশে এই ফাটল ধরে হাজির হয় সামরিক শাসন।

উৎকোচ প্রধানত টাকা-পয়সা বা সম্পদের লেনদেন। কিন্তু তা অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিণাম সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যের দিগন্ত ক্রমশ সংকুচিত হয়। ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আকারহীন পিণ্ডের দোসর বনে যায়। কবন্ধের জুলুম শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে।

সংকট-সমাধানের কথা বহুজন ভেবে থাকেন। কিন্তু সেইখানে পথও মসৃণ অথবা সমস্যা সহজ নয়। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্পত্তি-সম্পদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই গাজর গর্দভের সম্মুখে ইনসেনটিভ বা প্রয়োজক হিসেবে ঝুলেত না রাখলে তার চলৎশক্তি খোলে না। শাস্ত্রকারগণ কর্মযোগীর কথা বলেছেন, যারা ফলের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই ব্রত-সম্পাদনে সদা-মোতায়েন থাকেন। আদর্শ হিসেবে তোফা। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ প্রয়োজকের কথা ভাবতে হয়। তখন সামাজিক পুরস্কারের নিশান টানানো ছাড়া পথ থাকে না। ইউটোপিয়ার নকশা আঁকা সহজ। বাস্তব রূপে তা পাওয়া দায়। লোভ বজায় রেখে মানুষকে নির্লোভ করার দায়িত্ব হয়তো সকল যুগেই থাকবে। খ্যাতি, যশ, মান—গুণান্বিত লোভেরই এক দিক। সামাজিক পুরস্কার যতখানি নির্বস্তুক হয়ে উঠবে জীবনযাপনের বস্তুভিত্তির উপর, সেই সমাজের পরাকাষ্ঠা ততখানি। একথা বর্তমানে সকলে স্বীকার করেন।

উৎকোচ-প্রসঙ্গে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

এতৎসঙ্গে অবিশ্যি স্মর্তব্য—বারাঙ্গনামাত্রেই একদা ছিল অরমিত কুমারী।

২

নায়কের নাম এই কাহিনীতে উহ্য। তাকে আমরা রাজপুরুষ বলব। বড়ো নয়, তবে পদ অফিসারের। যদিও কোনো এক বিভাগের কর্মচারী নিয়ে কথকতা, তবু এমন নৈতিক সংকট কেবল ওই এক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবিকার নানা পর্যায়ে এমন দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে। বেতনদাতাও এই গণ্ডির মধ্যে পড়ে। তারও জীবিকা আছে। এমন ব্যাপক অর্থেই জীবিকা শব্দটি এখানে গৃহীত। লেখক, প্রকাশক, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, ফার্মের স্বত্বাধিকারী, বিজনেস হাউসের পরিচালক অগয়রহ—যে-কেউ বিভিন্ন রূপে এমন নৈতিক-সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। শুধু কাহিনী-কথনের সুবিধার জন্যে এক ব্যক্তি বা বিভাগের উল্লেখ আছে। তাই কারো নাম খুঁজতে যাবেন না। সব বিমূর্ত। কোথাও পেশা, কোথাও সম্পর্কের সড়ক ধরে সকল সম্বোধন সম্পাদিত।

কলেজে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারপর দশ বছর লা-পাত্তা। রাজপুরুষ অবাক হয়ে যায়, এক সাবেক সহপাঠী বাড়ি এসে উপস্থিত।

কারো অবয়বে তেমন অদলবদল ঘটে নি। সুতরাং নিমেষে চেনা-পর্ব সমাপ্ত।

—তুমি!?!??

—তুমি!!!???

—বসো বসো। বাড়ি চিনলে কী করে?

—গেজেটেড অফিসারদের বাড়ি কাক-পক্ষী চেনে।

—কোথা ডুব দিয়ে ছিলে এতদিন?

—বলব বইকি। সজনি, সব ধীরে—ধীরে।

সহপাঠী এবং রাজপুরুষ অনেক অতীত ইতিমধ্যে চায়ের কাপের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রাজপুরুষ কর্মপিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছিল, ফল খুব ভালো হয় নি। শেষে কান্টমস—শুল্কবিভাগে এক হিল্লে হয়। সহপাঠীর কোনো স্থায়ী জীবিকা নেই। যখন যা জোটে গা ভাসিয়ে দেয়।

ছুটির দিন ছিল না বলে সেদিন আসর জলদি ভেঙে যায়। পরবর্তী শনিবারের বিকেল, রোববারে সব অন্ধকার দূরীভূত। দশ বছর আর গত দশ বছর থাকে নি। পুরাতন সাহচর্য নতুন হয়ে উঠল। এক মাসে উভয়ের আরো মজলিস বসল। সহপাঠী আসর-গুলজারে অদ্বিতীয়। পুরাতন সকল খেই পাকড়াতে কারো বিলম্ব হয় নি।

একদিন রাজপুরুষের আপিসে টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো। রাজপুরুষের হাতে রিসিভার।

—অবসর আছে?

অন্যপারে প্রশ্নকর্তা সহপাঠী।

—আছে। তোমার জন্যে আছে।

—অফিসার মানুষ। আমাদের মতো টোটো কোম্পানি নও। তাই আগেভাগে নোটিশ।

—এসো। চা খেয়ে যাও।

—আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি।

সহপাঠী অতঃপর হাজিরা দিয়েছিল। হাতে এক সুশোভন ব্রিফকেস। যদিও চায়ের কাপের উপর বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পলিসি ঠিক হয়, সহপাঠী সেদিন তার উদ্দেশ্য উহ্য রেখেছিল। শুধু সাহচর্যের লোভেই তার উপাত, —বিদায় নিয়েছিল এমন ভাব পেছনে রেখে।

তিনদিন পরে এবার আপিস নয়, বাড়ি চড়াও সহপাঠী।

—কী খবর, ওল্ড বয়? রাজপুরুষ অভ্যর্থনা জানায়।

—খবর আছে বইকি।

—একটু রসো। চা আনিয়ে নিই।

পরিস্থিতি তরল করতে সেদিন সহপাঠীর কোনো সংকোচ ছিল না। শুল্কবিভাগে তার একটা জরুরি কাজ আটকেছে। জীবিকার কোনো বাঁধা রাস্তা নেই। জাবনা অনুযায়ী বাথান-বদল। বর্তমানে সে 'উজানী ট্রেডার্স' নামে এক ফার্মের সঙ্গে জড়িত। তাদের একটা কেস আছে কাস্টমসে।

—উজানী ট্রেডার্স? না, তেমন কোনো ফাইল এখনও আমার কাছে আসে নি।

—আসে নি। তবে আসতে পারে। তুমি ঠিক জান আসে নি? সহপাঠী সন্দেহ প্রকাশ করে।

—বহু ফাইল পাশ হয়। তবে ও-নামে কিছু আসে নি। যদি আসে—

—ধরে রেখো। আর আমাকে খবর দিও।

—কেসটা কী?

—কোন একটা অ্যানোমালি অর্থাৎ অসংগতি আছে। আমার সব জানা নেই। পরে বলব।

রাজপুরুষ আশ্বাস দিয়েছিল, 'তুমি ইন্টারেসটেড। উজানী ট্রেডার্স'—নাম মনে থাকবে বইকি। তবে খোঁজ নিও।'

—তা নেব বইকি। আমার তো যখন-যা-পাই-ধরে-খাই-গোছের জীবিকা। খোঁজ নিতেই হবে।

—আমি চট করে কিছু করে বসব না, তুমি যখন ভেতরে আছ।

—ধন্যবাদ।

ধাইয়ের কাছে কোঁক চাপা থাকে না। রাজপুরুষের কাছে দু-তিন দিনের মধ্যে সব হদিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যায়, 'উজানী ট্রেডার্স' লাইসেন্স-অধীন কিছু মাল আমদানি করে। পরিমাণে অসংগতি তো আছেই, তা ছাড়া বাজারে মালের চলতি যা দাম ইনভয়েসে দাম তার চেয়ে ঢের কম। একে আন্ডার-ইনভয়েস বলে। ইনস-পেক্টার এইসব গরমিল-অনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছে। আইনত অপরাধ। মাল বাজেয়াপ্ত, জেল, জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল—সব-কিছু হতে পারে। অফিসার বিচারকর্তা।

সহপাঠী বাড়ি এসে ধরনা দিলে। একদম কাকানো অনুরোধ : বাঁচাও।

—আমি কী করতে পারি? বাঁধা আইন।

—তুমি পার।

—তোমার খাতিরে ওদের জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া যায়।

—তা হলে ব্যাবসার আর থাকবে কী? লাইসেন্স বাতিল। আমারও রুজি গেল।

—ব্যাবসা থাকবে না কেন?

—বাজারে সুনাম গেলে আর ব্যাবসা থাকে?

—ইনসপেকশানের সময় ধরাধরি করে নি কেন, ভেতরে যখন গলদ?

সহপাঠী চেপে গিয়েছিল। ওদের চেনা ইনসপেকটর ইতিমধ্যে বদলি হয়ে যায়। ফলে, এই গণ্ডগোল। চোরের দশ দিনের জায়গায় এবার গেরস্থর এক দিন এসে গেছে। গেরস্থ এখানে শুল্কবিভাগ।

মাকু ঠেলাঠেলি চলল দু-তিন দিন।

পুরাতন ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর অনুরোধ। ফাটা অসোয়াস্তির মধ্যিখানে পড়েছিল রাজপুরুষ।

ভালো ছাত্র ছিল কলেজে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রাজপুরুষের চোখ যায় নি, এমন অপবাদ কেউ দেবে না। সামাজিক সমস্যাবলী তার ধী-শক্তিসমীপে আছাড় খেত বইকি। কিন্তু তেমন আমল পেত না। তার সহ-পাঠী অনেকে রাজনীতি নিয়ে বেশ মশগুল ছিল। রাজপুরুষ তর্কচ্ছলে সময়-কাটানোর নিমিত্ত হিসেবে তাদের গ্রহণ করত। তার বেশি না। সামাজিক দায়িত্ব মানুষের আছে। কিন্তু সেই বোঝা বইতে লাখ-লাখ মাথা প্রয়োজন। সেখানে একটি মাথা না থাকলে কী আসে যায়? এবংবিধ আঁচড় লাগত রাজপুরুষের মনে। অন্যদিকে 'কেরিয়ার'-গঠনের উচ্চাশার কোনো ভেলকি তার সামনে ছিল না। চার বছর চাকরি হয়ে গেল। সে উপরি-রোজগারের কথা কোনোদিন ভাবে নি। যদিও তার কানে পড়ত উর্ধ্বতন-অধস্তন সহকর্মীদের কপাল-চমকানোর কথা। শুল্কবিভাগে আইন আছে। সেই মাপ-কাঠি দিয়ে ফাইলের উপর বিচরণ এবং মন্তব্য-দান ছাড়া একটি অফিসারের আর কী কাজ থাকতে পারে? অন্য কিছু ভাবত না রাজপুরুষ।

সহপাঠীর অনুরোধ তার কাছে প্রথম ধাক্কা এবং তা আশ্চর্যজনক। তার অধস্তন কোনো সহকারী তার কাছে বায়না ধরে নি কোনোদিন। যদিও স্বভাবে পরিহাস-প্রিয়, কিন্তু আপিসে রাজপুরুষ রীতিমত আমলা অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাট। আপিসে গল্প করা ছিল তার ধাতের বাইরে। সবাই জানত, বড়ো রাশভারি অফিসার।

সহপাঠী পরদিনই বাড়িতে এল ধরনা দিতে। অসোয়াস্তি আছে, তবু রাজপুরুষ কোনো ত্রুটি রাখে না অভ্যর্থনায়। অবিশ্যি সব কথা শেষে এককথায় গিয়ে ঠেকে।

—কী করবে ভাবছ? সহপাঠীর প্রশ্ন।

—কিছু করা যাবে না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখো।

—অনুরোধ কী করে রাখব?

—তুমি ইচ্ছে করলে পার।

অন্দর থেকে এই সময় একটা কালো রঙের পুড্‌ল্‌ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। এইজাতীয় খুদে সাইজের কুকুর কয়েকবার রোয়াব ঝেড়েই ঠান্ডা হয়ে যায়। রাজপুরুষ ওটাকে সামলে নিজের কোলে তুলে নিলে। কুকুরের কালো পশমি জঙ্গলে বিচরণশীল তার পাঁচ আঙুল। যেন সে-মুহূর্তে তার সামনে আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী তো বেকার নয়। সে এক্তেলা দিলে।

—তুমি পার। খুব ঠেকা। তাই তোমার কাছে এত অনুরোধ। নচেৎ—

রাজপুরুষের জবাব দিতে বিলম্ব ঘটে। সময় যেন চোখ বুঁজে আছে, আদরলোভী পুড্‌লের তৎকালীন চোখের মতো।

কিন্তু উত্তর শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। 'আমার পালটা অনুরোধ। উজানী ট্রেডার্স নিয়ে তুমি আমাকে আর কিছু বোলো না।' হাজার হাজার অসোয়াস্তি রাজপুরুষ গলা থেকে নিমেষে উগরে দিলে।

তারপর স্তব্ধতা পৃথিবীময়।

কিন্তু সহপাঠী নাছোড়বান্দা। সে বেশ শান্ত এবং জোরালো কণ্ঠে বললে, 'ওল্ড ফ্রেন্ড তুমি। আমি সব তাস খুলে ধরছি তোমার সামনে। তুমি আমার জন্যে একটা কিছু করবে—এই আশায়।'

—আমি—! রাজপুরুষ যেন ককিয়ে উঠল।

এই 'ডীল' যদি হয়, পার্টি বিশ হাজার টাকা খরচে রাজি। আমি ভেবে রেখেছি, আমার দিন-গুজরানের জন্যে পাঁচ হাজার রেখে দেব। বাকি পনেরো হাজার তোমার। এখন তুমি ভেবে দেখো। সহপাঠীর কণ্ঠস্বর আগের মতো শান্ত এবং জোরালো।

বক্তা চলে গিয়েছিল। সেদিন আর কোনো কথা হয় নি।

রাজপুরুষ ধাক্কা খেয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা একসঙ্গে রোজগার? বিনা মেহনতে! পৃথিবীতে এইজাতীয় ব্যাপার ঘটে সে শুনেছে, পড়েছে। কিন্তু এমন চাক্ষুষ দেখে নি। দেখার তো কিছু বাকি নেই। বাকি স্রেফ একটা 'নড'। বাকি স্রেফ সম্মতিসূচক ঈষৎ শিরোভঙ্গি।

দেওয়ালের কান থাকে। শত শত পোস্টার দেখেছিল রাজপুরুষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। লোকের কানাঘুষা তো থামবে না। পেছন থেকে মন্তব্য চলবে, সামনাসামনি না হোক। অধস্তন সহকর্মীরা কী ভাববে? তাদের ইঙ্গিতময় চোখ-ঠারাঠারি রাজপুরুষ তখনই দেখতে পেলে।

সহপাঠী এক ধন্দে ফেলে গেল। চব্বিশ ঘন্টা রেহাই নেই হাতছানি থেকে। পনেরো হাজার টাকা? মানে অনেক কিছু। সাহিত্য-রসের প্রতি রাজপুরুষের তেমন আকর্ষণ ছিল না কোনোদিন। তাই বলে কল্পনার দৌড় থেমে রইল না। পার্থিব কত সুখের হাতছানি সঙ্গে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বহু ধরনের নিরাপত্তা আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কৃতিত্ব ব্যক্তিত্বের পরিধি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক দূর ঠেলে দেয়। অন্যদিকে—আপিসের মধ্যে কানাঘুষা এবং হঠাৎ ব্যক্তিত্বের ওজন-চুপসানো কৃত্রিম ভার নিয়ে দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কশাঘাত। বহু মানুষের সামনে ছোটো হওয়া কি বিধেয়?

এককথায়, আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত রাজপুরুষ।

কয়েক দিনের মধ্যে এবং তা দৈব ব্যাপার বলা চলে, রাজপুরুষ হঠাৎ কূল পেয়ে গেল।

হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই ছুটির ঘন্টা দুই আগে সে বাড়িতে ফিরেছিল। রাজপুরুষের পিতা ছিলেন গোছালো সংসারী মানুষ। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা-উৎকণ্ঠিত। রাজপুরুষের বর্তমান বাড়ি পৈতৃক-সূত্রে পাওয়া। উপর-নীচে চার-কামরার দোতলা। নীচে ডাইনিঙ রুম। অপর কামরা ভৃত্যাধীন। উপরে বেড-রুম। অন্য কক্ষ ড্রয়িংরুম। এখনও বাড়িতে কোন ছেলেপুলে আসে নি। সুতরাং প্রশস্ত বাসভূমি।

কড়া নাড়তে কিশোর ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। রাজপুরুষ হনহন করে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ি থেকেই তার চোখে পড়ল বেডরুমের দরজা ঈষৎ খোলা। অথচ এই সময়ে বন্ধ থাকার কথা। বাড়িতে কেউ এলে তা জানালা দিয়ে দেখার বন্দোবস্ত আছে। সেই অনুযায়ী উপরের দরজা খোলা হয়। একা-একা থাকার ঝামেলা অনেক। স্ত্রী রাজপুরুষের চেয়ে সেদিক থেকে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। দরজার পাল্লা ঈষৎ খোলা দেখে আশঙ্কিত, কৌতূহলী ; সন্দিগ্ধ রাজপুরুষ সন্তর্পণে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে গেল। তিন-চার ইনচি ফাঁক দুই পাল্লার মধ্যে। রাজপুরুষ দু-চোখ দূরবীন বানিয়ে নিলে। লণ্ডশটে ধরা পড়ল—গৃহিণী একদম বিবস্ত্র। দিগম্বরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে চিরুনি। শাড়ির স্তূপ খাটের উপর। পাশে উবু বসে আছে কালো পুড্‌ল্‌, তার সারমেয়-দৃষ্টি নিয়ে মনিবের দিকে। চুলে চিরুনি চালানোর কালে মাঝে-মাঝে কুকুরের দিকে চেয়ে দিগম্বরী মুচকি হেসে আবার নিজেকে ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে সোপরন্দ করছিল। রাজপুরুষ হতভম্ব। নীরব দর্শক। ফোকাসের উপর অবিচল দৃষ্টি। এক সময় সেও মুচকি হেসে ফেলে। এমন দিগম্বরী সে দিনে কখনও দেখে নি। এক সময় ধৈর্য-টলমল রাজপুরুষ দ্রুত পাল্লা ঠেলে হেঁকে ওঠে, 'আ রে, এ কী??!'

সহধর্মিণী প্রায় আঁতকে উঠেছিল কোনো আততায়ীর আশঙ্কায়। কিন্তু ঝটিতি নিজেকে সামলে নেওয়ার পূর্বে শাড়ির স্তূপ সামলাতে থাকে এক কোণে সরে এবং মুখ খোলে, "এ-ই তুমি। এমন হঠাৎ অসময়ে—।"

—দরজা খুলে রেখে—এসব কী খেয়াল চেগেছিল—? অন্য জনের প্রশ্ন।

—দরজার কথা খেয়াল ছিল না। গৃহিণী তখন দ্রুত বসনের তলায় প্রবেশার্থী। আরো যোগ করলে,—তুমি বুঝি আড়ি পেতে দেখছিলে?

—দরজা খোলা। চোরের ভয়। বদমাশের ভয়—।

—বদমাশের ভয় নেই। এক তুমি ছাড়া। আর—। বাক্য অসমাপ্ত। সহধর্মিণী এবার হেসে উঠল স্বামীর দিকে চোরা চাউনি হেনে।

—কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার সাধ কেন? রাজপুরুষের গলার আওয়াজ তরল হয় না।

—মানুষের কখন কী খেয়াল হয় তার বাঁধাধরা কোনো আইন আছে নাকি? প্রায়-সংযত-বসন স্ত্রী মুখঝামটা দিয়ে উঠল।

—কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার বাসনা কেন? রাজপুরুষ অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে পারছিল না।

গৃহিণী এবার গলায় কিঞ্চিৎ ঝাল মিশিয়ে নিলে,—কী ঘাট হয়েছে তাতে শুনি? বিবস্ত্র হয়েছি তো কুকুরের সামনে। মানুষের সামনে তো না।

ইতিমধ্যে পূর্ণ সংযত-বসন স্ত্রী স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং আপ্তকণ্ঠে বলে,—কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে হলে ঘোর অপরাধ। বুঝেছেন, মিস্টার?

কৌতুক-দৃষ্টি আবার নিক্ষিপ্ত।

রাজপুরুষ হঠাৎ সঙ্গিনীকে আলিঙ্গনে বাঁধে। এবং এবং একটু পরেই পাশ খানিক শিথিল করে বলে—আগে হাতে হাত মেলাও। তারপর স্ত্রীকে একদম আলিঙ্গনপাশ থেকে নিষ্কৃতি দেয় সামনাসামনি ঈষৎ তফাতে ঠেলে।

—হাত মেলাব? আমি?

—হ্যাঁ, তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। রাজপুরুষ স্ত্রীর উপর নিবন্ধ-দৃষ্টি অনুরোধ প্রসারিত রাখে—বাক্যটা আবার উচ্চারণ করো।

বিস্মিত সহধর্মিণী ধীরে ধীরে বলতে থাকে পুনরায়,—কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে অবিশ্যি অপরাধ।

তারপর উভয়ের হাতের ঝাঁকুনি আর সহজে থামে না।

২

সহপাঠী পরদিন হাজির হয়েছিল। একবার দুপুরে আপিসে, আবার সন্ধ্যায় বাড়িতে, ঘোড়েল ব্যক্তি। অনভ্যাসের ভয় থাকে। সহপাঠী হিম্মত জুগিয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা তো নস্যি। যে-কোনো অফিসারের ঘর থেকে বেরুতে পারে। রাজপুরুষের ভয়টা কোথায়? সে ধনীর সন্তান। তার স্ত্রী ধনীর দুলালী। উপরন্তু চাকরি চার বছরের। পনেরো হাজারের হিসেব দিতে হবে নাকি? যদি ফেউ লাগে। দুর্নীতি-দমন বিভাগের কেউ? সই-করা-নোট-যোগে যদি ফাঁসিয়ে দেয়। পুরাতন সহপাঠীকে অবিশ্বাস? সে নিজে ট্যাকসি করে এসে পাওনা মিটিয়ে যাবে। সংকোচের কিছু নেই। আর নেহাত যদি রাজপুরুষ হতাশ করে উপরে ছুটতে হবে। কালেকটর আছে। সবার উপরে বোর্ড-অব-রেভেন্যু—রাজস্ব বোর্ড আছে। তখন খরচ হয়তো বেশি। কিন্তু তার পনেরো হাজার—আর থাকল না। অত টাকা কি বানে ভেসে আসে? লোকনিন্দার ভয়? কিন্তু লোক কোথায়?

কুকুরের সামনে বিবস্ত্র হওয়া অপরাধ নয়।

পরবর্তী অধ্যায়।

সহপাঠী জিতে গেল।

তবু কাহিনীর সামান্য জের আছে। তা-ই পরিশেষে বিবৃত।

অন্ধকারে বিরাট মাঠে ভয় পেলে মানুষ গান ধরে। হিন্দু মন্ত্র জপে, মুসলমান পড়ে দরুদ। দুই বাহনই জাগতিক কাজে জবর লাগে।

রাজপুরুষ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন সহপাঠীর সঙ্গে রাখী-বন্ধন হল নতুন করে। কলেজ-জীবন আবার বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কত সন্ধ্যা অভিজাত হোটেলে কেটে গেল। রাজপুরুষ বীয়ার পান করে। সহপাঠী আরো কঠিন পদার্থে তৈরি। তার প্রয়োজন হয় আরো কড়া চোলাই। রাজপুরুষের গৃহিণী এ-সবের শরিক নয়। টাকা বাড়ির মধ্যে কোথাও ছিল। কিন্তু সে জানে না। রাজপুরুষ একদিন ভাববে, গৃহিণীকে সুখ-সন্ধ্যার ভাগী করা উচিত। কপোত-কপোতীর সংসার। এক সন্ধ্যা ঘরে উনুন না জ্বালিয়ে বাইরে দুজনে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতে পারে। খরচ বেশি। সেই টাকায় ঘরে আরো ভালো খাওয়া যায়। তার জন্যে অত ভাবনার কিছু নেই আর। সেদিন সহপাঠী অবিশ্যি বাদ থাকবে। তাকে ছাড়াই একসন্ধ্যা নীড় ছেড়ে তারা বিবাগী ডানা মেলে দেবে। সেদিন আপিস থেকে ফেরার সময় রাজপুরুষ এক শিশি দামি পারফিউম কিনে ফেললে স্ত্রীর জন্যে। পরবর্তী সন্ধ্যার পরিকল্পনা বাড়ি গিয়ে করা যাবে। কোথাও ক্যাবারে নাচ দেখা যেতে পারে। না, একদম অন্দরে লাফ দিলে গৃহিণী সন্দেহ করবে। তার চেয়ে কোনো অভিজাত হোটেলে দামি ভোজনই উত্তম।

পরদিন সকাল। ছুটির দিন। একটু দেরিতে দম্পতি চা খেতে বসেছিল। রোববার কি ছুটির দিন তারা নীচে ডাইনিংরুমে চা খেতে যায় না। উপরে ভৃত্য ট্রলিযোগে সাজিয়ে আনে। আহার্য-তালিকা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু লম্বা হয়। ভোজনে ব্যস্ততা থাকে না। ছুটির দিন। খ্রীস্টান ঈশ্বরের মতো সবাই বিশ্রামার্থী।

কেটলি থেকে রাজপুরুষ চা ঢালছিল। ছুটির দিন রুটিন উলটে যায়। গৃহিণী যেন সম্রাজ্ঞী। হুকুম-তামিলের ভার মিস্টারের উপর।

রাজপুরুষ প্রস্তাব উত্থাপন করলে—আজ সন্ধ্যায় বাইরে খেলে কেমন হয়?

—খুব ভালো। একঘেয়েমিও কাটে।

—গুড।

—কিন্তু খরচ?

—একবেলার লাট। কত আর যাবে?

—তোমার হিসেব তুমি বোঝ গে।

—তুমি প্রচণ্ড বাক-পটীয়সী।

—সার্টিফিকেট দিচ্ছ?

—না।

—নমুনা কোথা থেকে পেলে।

—প্রতিদিন পাই। তবে সেদিন একটা কথা বলেছিলে বটে!

রাজপুরুষ এই সময় চায়ের কাপ স্ত্রীর হাতে তুলে দিলে। অন্য কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললে—সেদিনের বাণীমন্ত্র আবার শোনাও।

—কোন্ দিনের?

—সেই দিগম্বরী অপরাহ্নের। রাজপুরুষ স্মিত হাসির জের কক্ষময় ছড়িয়ে দিলে।

—যাঃ! অপরপক্ষ তাচ্ছিল্যতায় সব উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

—একবার বলো না। রাজপুরুষ গলায় মিনতি মাখায়।

সংকোচে আড়ষ্ট গৃহিণী প্রথমে আঁচল দিয়ে ঠোঁটের হাসি আড়াল করে। এবং হঠাৎ আঁচল সরিয়ে গড়গড় করে বেশ জোরেই বলে ফেলে—কুকুরের কাছে ন্যাংটো হওয়া যায়, মানুষের কাছে না।

রাজপুরুষ অতি আনন্দিত, উৎসাহিত মন্তব্য যোগ করে—দামি কথা। দামি মন্ত্র।

স্ত্রী স্বামীর চোখে চোখ ফেলে বলে—স্যার, কথার আর-একটু বাকি থেকে গেছে।

—বলো, বলো। স্বামীর যেন তর সয় না।

—কুকুরের সামনে কুকুর নিশ্চিন্তে ন্যাংটো থাকে।

৩

এটুকু উচ্চারণের পর স্ত্রী খিকখিক হাসি আরম্ভ করে।

—ও—। প্রলম্বিত এই স্বরবর্ণের উপর রাজপুরুষ গোটা বাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করতে লাগল সেই নির্বিবাদ ছুটির সকালে।

পশুর নিকট উলঙ্গ থাকিতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।

পশু পশু-সমীপে বেমালুম ন্যাংটো থাকে।

গুরুজীর সঙ্গে চীনে

শ্যামাদাস চক্রবর্তী

ছয়ই সেপটেম্বর সকাল আটটা দশ মিনিটে ছত্তদু বিমানবন্দর থেকে রাশিয়ান প্লেনে চেপে রওনা হলাম। সাঙহাই বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ঘণ্টা তিনেক বাদে।

সাঙহাইতে আমরা ছিলাম জিন জিয়াঙ হোটেলে। সন্ধে সাতটায় একটি বড়ো হোটেলে গুরুজীর সম্মানে একটি সংগীত-সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাংকোয়েট দেওয়া হয়। ওঁদের অভ্যর্থনার উত্তরে গুরুজী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, চীনে আসার শখ তাঁর বহুদিনের। সাতান্ন সালে তাঁর দাদা-বউদি এসেছিলেন। উনি নিজের চোখে একটি ফোটোতে দেখেছেন যে উদয়শঙ্কর ও অন্যান্য শিল্পীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর মাও সে-তুঙ, চু এন-লাই প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কেরা মাটিতে পায়ের কাছে বসে। সেই থেকেই ওঁর ইচ্ছে চীনে আসবার। দুদেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগ এবং কলা এবং সংগীতের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মৈত্রীর সেতু বাঁধবার প্রয়োজনীয়তার কথাও গুরুজী ওই সভায় বললেন। ওঁর ভাষণটি খুব সমাদৃত হয়। পরিবেশিত খাদ্যের মান ছিল খুবই উচ্চ। এখানে একটি নতুন রান্না খেলাম—একটি গোটা চালকুমড়োর মধ্যে অন্যান্য জিনিস দিয়ে বানানো সুপ।

সাতই সেপটেম্বর সন্ধ্যা সোয়া সাতটা নাগাদ সাঙহাই কনসার্ট হলে গুরুজীর অনুষ্ঠান হল। ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের এই অনুষ্ঠানে উনি বাজালেন প্রথমে সংক্ষিপ্ত আলাপসহ রূপক তালে দুর্গা, বিলম্বিত তিনতাল আর দ্রুত একতালে কিরবানি, ঝিঁঝোটিতে আলাপ, জোড় আর ঝালা এবং কাহারবা আর দ্রুত তিনতালে মাঝখামাজ। দুর্গার গতটি খুবই সুন্দর হয়েছিল, আলাপটি ছোটো হলেও ছিল সংহত, পূর্ণাঙ্গ। কিরবানির গতটি ছিল মিষ্টি, তাতে শৃঙ্গার-রসের ভাবই বেশি। দুর্গার গাম্ভীর্য এবং ভক্তিভাবের ধ্রুপদী উচ্চারণের পর একটু রঙিন লঘু স্বপ্নবিহারের মতো। ঝিঁঝিটের করুণ আর মধুর রস খুব চট করেই জমে গিয়েছিল। আর মাঝখামাজে গুরুজী রঙ ভরে দিয়েছিলেন। গত বাড়িয়ে লালুকে যথারীতি একেকবাদনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

পরের দিন, অর্থাৎ আটই সেপটেম্বর সকালে আমরা জেড পাথরের বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি দেখতে গেলাম। জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকে ধূপ জ্বেলে আরতি করে প্রণাম করলাম। গুরুজী কিছু প্রণামী দিলেন।

ওই দিনই সন্ধে সোয়া সাতটায় সাঙহাই কনসার্ট হলে গুরুজী সংগীত পরিবেশন করলেন। প্রথমে বাজালেন ভূপালী, মধ্যলয়ে তিনতালে। তারপর চারুকেশী, বিলম্বিত তিনতালে আর দ্রুত একতালে। বিরতির পর প্রথমে আভোগী রাগে আলাপ, জোড় আর ঝালা, এবং সবশেষে মিশ্র পিলু—প্রথমে দাদরায়, পরে দ্রুত তিনতালে। বাজনার শেষদিকে যথারীতি একক তবলাবাদন আর সওয়ালজবাবের প্রভূত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে শ্রোতারা অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ করেছিল।

নয়ই সেপটেম্বর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা গেলাম সাঙহাই কনজারভেটরি মিউজিক স্কুলে। এটি পঞ্চাশ বছরের পুরনো নামজাদা একটি সংগীত-বিদ্যায়তন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আটশ, আর শিক্ষক রয়েছেন শ-পাঁচেক। ওখানে প্রথমে পাঁচ-ছ জন ছাত্রছাত্রী ওদের দেশের নানারকম যন্ত্র বাজিয়ে শোনাল। মনে হল যেন ওইসব সুরের মধ্যে ভূপালী, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি রাগের বেশ কিছু আভাস পাচ্ছি।

এরপর গুরুজী বসলেন লেকচার ডেমনস্ট্রেশন দিতে। আগে জেনে নিলেন এর আগে তাঁর বাজনা কেউ শুনেছেন কিনা। মাত্র কয়েকজনই হাত তুলল। অতএব সবাইকেই নতুন ধরে নিয়ে একেবারে গোড়াকার কথা দিয়েই গুরুজী শুরু করলেন। আগে যন্ত্র আর যন্ত্রীর পরিচয় দিলেন। তবলার বিভিন্ন বোল লালুকে দিয়ে বাজালেন। তারপর সেতারে পরদায় পর-পর বিভিন্ন স্বর বাজিয়ে আবার দেখালেন যে, ওই একই সুর তার টেনে মীড়েও বাজানো যায়, এবং তাতে শ্রুতির প্রয়োগটি যথার্থভাবে করা যায়। তারপর ঠাটের বিবরণ দিলেন, তার উৎপত্তিও দেখিয়ে দিলেন।

এর পর বললেন, ভারতীয় মার্গসংগীত বলতে আমরা যা বুঝি, ঠিক সে ধরনের উচ্চাঙ্গ সংগীত পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, কারণ রাগরাগিণীর সিস্টেম একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে। ওরা জানতে চাইল, রাগরাগিণীর মানে কী।

গুরুজী তখন বেহাগ রাগকে অবলম্বন করে উদাহরণসহযোগে রাগের স্বরূপ বোঝাতে লাগলেন। একের পর এক বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, পরদাগুলিতে বেহাগের চলন বাজালে যেমন বেহাগ রাগ হবে না, বেহাগের মতন কিছু একটা হবে, তেমনি ঠাট বা স্কেল এবং আরোহণ-অবরোহণও রাগ নয়।

শুনতে-শুনতে আমিও তন্ময় হয়ে গেছি। উৎকর্ণ হয়ে আছি, তাহলে এবার রাগ বলতে কী বলবেন? তক্ষুনি উনি বলে উঠলেন যে, এইসব বিন্যাসের কোনোটাই রাগ হবে না, যদি না কলাকার শ্রুতির যথার্থ প্রয়োগ করেন। বলেই উনি হাতেকলমে মীড়সহযোগে বেহাগের নিজস্ব চালটিতে যথোপযুক্ত অলংকার আর যতি-সহকারে দেখিয়ে দিলেন যে শ্রুতিটি ঠিক কীরকম লাগছে। বললেন, এই যে শ্রুতির প্রয়োগ হল—এইবার এটাকে বলব রাগ। তার আগে পর্যন্ত যা করেছি সেটা রাগে পৌঁছবার রাস্তা মাত্র। আরো বললেন, কোনো মানুষের স্কেচ করতে গিয়ে একেক করে যখন তার মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ আঁকা হয়, তাতে শুধু ছবিটার আউটলাইন রচিত হয়; তেমনি পরদা, ঠাট, চলন ইত্যাদিও হল রাগের ফ্রেমওয়ার্ক। কিন্তু ওই ছবিটা তখনই জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠবে যখন তাতে প্রাণ আসবে, সেটা কথা বলবে, নড়াচড়া করবে। তেমনি রাগের ফ্রেমওয়ার্কেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তখনই যখন শ্রুতির যথার্থ প্রয়োগ ঘটবে, এবং তা অন্তরের অন্তস্তলে আসন লাভ করবে।

এই প্রসঙ্গে গুরুজী এক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর গুরুর সাক্ষাৎকারের কাহিনী শোনালেন। মহাকাশরকেট নিক্ষেপ করার প্রকল্পের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকটি যুক্ত আছেন শুনে আলাউদ্দীন খাঁ প্রথমে মহাকাশজয় নিয়ে শিশুসুলভ বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন মাটির কতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়েছে। উত্তর পেলেন, খুবই সামান্য। বৃদ্ধের পরবর্তী প্রশ্ন, আর নিজের ভিতরে কতদূর যেতে পেরেছ? থতমত খেয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, একেবারেই না। তখন ওস্তাদ বললেন, তা হলে তোমরা করলেটা কী? তুমি যে আমার সংগীত শুনতে চাইছ, এই সংগীত ঠিকমতো বুঝতে হলে যে মনটাকে বাইরে থেকে গুটিয়ে এনে নিজের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে, বাবা।

এই কাহিনী শুনিয়ে গুরুজী বললেন, এখন তো বুঝলে আমাদের সংগীতের আসল রূপ আর চরিত্র কী। এ হচ্ছে অন্তর দিয়ে বোঝবার জিনিস, তন্ময় হয়ে

উপলব্ধি করার জিনিস। এর রস ঠিকমতো গ্রহণ করতে গেলে ভিতরে ডুব দিতে হবে।

গুরুজীর এই বক্তৃতাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছিল। এরপর গুরুজী মধ্যমসেগারার উপর আশ্রিত একটি ঠুংরি ধরনের রাগমালা বাজিয়ে শোনালেন, প্রথমে দাদরায়, পরে দ্রুত তিনতালে। লালু যথারীতি লহরা বাজাবার সুযোগ পেল। ওর বাজনা সেদিন খুব খুলেছিল।

সংগীতশিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে আমরা কিছু কেনাকাটা করলাম। সন্ধেবেলায় সাঙহাই অ্যাক্রোব্যাটিক সেনটারে ক্রীড়াকৌশলের বিস্ময়কর প্রদর্শন দেখলাম। খেলা দেখাল চীনের অনাতম সেরা দল সাঙহাই অ্যাক্রোব্যাটিক ট্রুপ। সারকাসে সাধারণত যেসব খেলা দেখে থাকি এখানেও সেইরকমের দুরূহ আর মজাদার সব ব্যাপার ছিল। কিন্তু মোটের উপর তার দক্ষতা আর শিল্পসৌন্দর্যের মান খুবই উচ্চ। কয়েকটি খেলা তো প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয়েছে।

দশই সেপটেমবর সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা দুঃসহ গরমের মধ্যে সাঙহাই বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়ে সোয়া পাঁচটার সময় ক্যানটনে এসে পৌঁছলাম।

ক্যানটনে মিউজিক ব্যুরোর সকল সদস্য এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে তুললেন তুঙ ফাঙ হোটেলে। এত সুন্দর হোটেল চীনের কোথায়ও পাই নি। এটি একটি ছোটোখাটো শহরবিশেষ।

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্যানটন থিয়েটার হলে গুরুজী বাজালেন। শুরু হল রূপক তালে ধানী রাগের গত দিয়ে। এরপর বাজালেন ইমনকল্যাণ, বিলম্বিত তিনতালে আর দ্রুত একতালে। এটি বাজালেন পুরোদস্তুর খানদানি মতে, অপূর্ব সুন্দর ঢঙে। বিশেষ করে শুদ্ধ মধ্যমটি লাগানো হচ্ছিল এমন আলতো অথচ অমোঘ স্পর্শে যেন একটা ঢেউ এক জায়গায় সহসা ধাক্কা দিয়েই চলে আসছে। খুব মন দিয়ে না শুনলে বোঝাই মুশকিল যে শুদ্ধ মধ্যমকে ছুঁয়ে যাওয়া হল। খুবই সুন্দর আর সংহত হয়েছিল বাজনাটি। ইমনকল্যাণের সবই ছিল এতে, অথচ অল্প আয়তনের মধ্যে আঁটোসাটো। অবশ্য সেদিনের সব কটি রাগের পরিবেশনই ছিল এমন গাঢ়বন্ধ, সুমিত এবং সুসমঞ্জস যে মনে হল যেন আগে থেকে হিসেব করে, প্ল্যান করে বাজানো। স্বল্পপক্ষণের বিরতির পর গুরুজী বাজালেন স্বরচিত মোহনকোষ রাগে আলাপ, জোড় আর ঝালা। মালকোষ প্রভৃতি কোষজাতীয় রাগের ভিত্তিতে রচিত এই রাগটি গান্ধীজীর প্রয়াণদিবসে তাঁরই স্মরণে রচিত। এই রাগটিও বেশ জমেছিল। অনুষ্ঠান শেষ হল মিশ্রগারা-ভিত্তিক রাগমালিকা দিয়ে। গতটি ছিল দাদরা আর দ্রুত তিনতালে নিবদ্ধ।

বারোই সেপটেমবর সকাল নটায় আমরা দক্ষিণ চীনের বৃহত্তম নদী হুং পার হয়ে ফু শান শহরে বেড়াতে গেলাম। ফু শান মানে বুদ্ধপর্বত। এই শহরের শিওয়ান সেরামিক শিল্প পৃথিবীবিখ্যাত। চীনামাটির কারখানাটির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে-ঘুরে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সব কটি পর্যায়ই একে একে দেখলাম। বিস্ময়কর ওদের দক্ষতা আর শিল্পসৌন্দর্যবোধ। কারখানার পর আমরা পিতৃপুরুষের মন্দির নামক সাড়ে সাতশ বছরের পুরনো উপাসনাস্থলটি দেখে এলাম। সন্ধ্যাটি কাটল একটি অপূর্ব-সুন্দর কালচারাল পারকে। এখানে মুক্ত আকাশের তলায় সবরকমের সাংস্কৃতিক চর্চা হয়। এই অবাধ পরিবেশে এতগুলি তরুণ-তরুণী এক জায়গায় জড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু কোথায়ও এতটুকু অশোভন বা উচ্ছৃংখল আচরণ চোখে পড়ল না।

সেই দিনই রাত্রে হোটেলের সামনে কর্মভিত্তিক নৈতিকতার একটি চীনা নমুনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। হোটেলের করিডর থেকে দেখলাম রাত্রির ফাঁকা রাস্তায় মেরামতির কাজ চলেছে। খানিক দূরে একটি ছেলে চুপচাপ বসে রয়েছে। দোভাষিণী মারফত প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ছেলেটির ভাই ওই রাস্তা-মেরামতির কাজ করছে, তার ডিউটি শেষ হবে রাত বারোটায়। তখন দুভাই একসঙ্গে ফিরবে বলে ছেলেটি বসে আছে। আমি দেখে অবাক হলাম, দু-ভাইয়ের কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছেও না। একজন চুপ করে বসেই আছে, অন্যজন একমনে কাজ করে যাচ্ছে

তেরোই সেপটেমবর। এবার হঙকঙ হয়ে দেশে ফেরার পালা। ক্যানটন থেকে সাড়ে চারটের সময় প্লেন ছাড়ল। ঘণ্টা আধেকের মধ্যেই হঙকঙ পৌঁছে গেলাম।

ক্যানটনেই চীনা দোভাষীদের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। বিদায় নেবার ক্ষণটি দু-পক্ষেরই খুব বিষাদের হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, এই সফর যে এত ভালো লেগেছিল, তার একটি কারণই হল দোভাষীদের সুন্দর আচরণ, সেবাযত্ন আর শ্রদ্ধাপ্রীতি। ওঁরা সকলেই আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, তবে ওরই মধ্যে কেউ কেউ আমাদের একেবারে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলেন—বিশেষত শ্রীমতী লাও আর লি চিন।

শ্রীমতী লাওয়ের আচার-আচরণ ছিল সুশীল। বয়স ওঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি, তিনটি সন্তানের জননী এবং গৃহিণী। কিন্তু দেখে বয়স বোঝা যেত না। স্বভাবটি বড়োই মধুর, অথচ বেশ ব্যক্তিত্বও আছে। গুরুজীর প্রতি ওঁর ছিল এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর সেবাপরায়ণতার মনোভাব।

গুরুজীও ওঁকে খুব স্নেহ করতেন।—ডাকতেন 'লা' বলে। উনি সর্বক্ষণ ছায়ার মতো পাশে-পাশে বা কাছাকাছি থেকে সেবাযত্ন করে যেতেন বলে গুরুজী ওঁকে মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, লা, তোমার বাড়িঘরদোর আছে, না সব বন্ধ করে এসেছ? শ্রীমতী লাও আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছেন। পেইচিঙে থাকতে সময় পেলে এক-আধবার হয়তো রাতে গিয়ে বাড়িতে একটু দেখা করে আসতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই থাকতেন হোটেলে।

দোভাষিণী হিসাবে লাওয়ের যোগ্যতা ছিল প্রশংসনীয়। ইংরেজির উপর সুন্দর দখল, তার উপর পরিষ্কার উচ্চারণ আর নিখুঁত শব্দচয়নের মধ্য দিয়েই তার নিঃসন্দেহ পরিচয় মিলত। এদিকে বেশ গাম্ভীর্য আর শালীনতাবোধও ছিল। কোনো চপলতা বা বাচালতা নেই। গুরুজীর সামনে খুব নম্র হয়ে নিম্নকণ্ঠে কথা বলতেন।

একটা উদাহরণ দিই। গুরুজীর সুটকেস গোছানোর একটা পদ্ধতি ছিল। একদিন দেখলাম উনি ধূপকাঠির প্যাকেট আর উপহারের কিছু সামগ্রী দিয়ে সুটকেসের ভেতরটা এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বসেছেন যে কিছুতেই আর জায়গায় কুলোচ্ছে না। শ্রীমতী লাও কাছেই ছিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দিব্যি বলে বসলেন, রবিজী, আমি তোমার এটা করে দিচ্ছি, তুমি সরো। গুরুজী আর ওকে আটকান করি? সুটকেসটা তৎক্ষণাৎ ওঁকে ছেড়ে দিলেন। লাও তখন পরিপাটি করে সুটকেসটা গুছিয়ে দিলেন। দেখা গেল, সব জিনিস বেশ ভালোমতোই ধরে গেছে। গুরুজী তো খুব খুশি।

আমি চুপ করে আছি। লাও ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন। আমার গালে আস্তে করে একটা চাপড় মেরে বললেন, এর পরের বার দেখে নিও কী করে তানপুরা ছাড়তে হয় আমি ঠিক শিখে নেব। তখন হয়তো রবিশংকরের শিষ্যা বনে যাব, তোমাকে আর ওঁর সঙ্গে আসতে হবে না।

দোভাষীদের সকলের সঙ্গেই আমার কমবেশি হৃদ্যতা আর বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল। বিদায় নেবার সময় ওঁরা বললেন, সত্যি, মনেই হচ্ছে না যে এতগুলো দিন পার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন এই সবে গতকাল তোমরা এলে। লি চিন অবশ্য পেইচিঙ থেকেই বিদায় নিয়েছিল। আসার সময় আমাদের জড়িয়ে ধরে ও আর ছাড়ছেই না, এত কষ্ট হচ্ছে। আর শ্রীমতী লাও তো আরো অনেকদিন কাটান আমাদের সঙ্গে। ক্যানটন বিমানবন্দরে যখন বিদায় নিলেন, তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু খেলেন। বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, ডোন্ট ফরগেট মী। গুরুজীও ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিছুই বলার নেই, ও শুধু মুখের দিকে চেয়ে আছে। বিদায়ের আগে গুরুজী ওঁদের, বিশেষত শ্রীমতী লাওকে, দুহাত ভরে বই, রেকর্ড প্রভৃতি উপহার দিয়েছিলেন। ওঁরা কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন।

আমার কথাটি ফুরোল। যদি এই মুহূর্তে কেউ আমার কাছে জানতে চায় যে এই সফরে কী পেলাম, তাহলে সত্যি কথা বলতে হলে বলব—ঠিক জানি না। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও নিরর্থক নয়। সেক্ষেত্রে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাক মূল্যায়নের জন্য বোধকরি কিছুটা কালগত ব্যবধানের প্রয়োজন। তবু যদি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথাই ধরি, তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে, এই ভ্রমণ আমাকে দিয়েছে অনেক। সব স্মৃতিই হয়তো সমান সুখকর নয়, কিন্তু কোনো তিক্ততা বা খেদও জমে নেই মনে। চীনবাসীর আন্তরিক প্রীতি আর মৈত্রী আমার অন্তরকে সিক্ত সম্পৃক্ত করে তুলেছে। যেখানেই গেছি সেখানেই ওরা আদর করে আমাদের গ্রহণ করেছে, কিভাবে সেবাযত্ন করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না! আর কী সরল বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ! সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধার লেশমাত্র নেই, যেন কতকালের চেনা বন্ধু।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্ত কর্মসূচীর ফাঁকে এত বড়ো একটা দেশকে আর কতটুকু দেখা যায়। কী-ই বা

বোঝা যায়? চীন দেখে এলাম এমন দাবি করা আমার সাজে না। বরং বলি, যেটুকু ওরা দেখাল তা যৎকিঞ্চিৎ হলেও আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওদের সম্বন্ধে ঢালাও কোনো মন্তব্য করার মতো ভূয়োদর্শন না ঘটলেও মোটা-মুটি একটা ধারণা গড়বার পক্ষে তা যথেষ্ট। চীনের মানুষজন এবং বিধিব্যবস্থার যতটুকু আমার নজরে পড়েছে তাতে অন্তত এটুকু বুঝেছি যে ওরা কতকগুলি প্রাথমিক ব্যাপারে সব মানুষের জন্য মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছে, এবং ব্যবহারিক সমাধানের চেষ্টায় বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। কোথায়ও মানুষে মানুষে আকাশপাতাল ফারাক চোখে পড়ে নি। দেখেছি অশন বসন শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান কর্মবিনিয়োগ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে ওদের সরকার কতটা সজাগ এবং সাধারণ মানুষের আস্থা-ভাজন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ওদের সমাজবোধ বা গণমুখী চেতনা। একজন নাগরিকের জন্য সরকার বা সমাজ যেমন যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করছে, তেমনি সেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশ আর দশের জন্য কিছু করবার প্রেরণা অনুভব করছে। দেশ এবং জাতির জন্য মমত্ববোধ ওদের চলনে বলনে কাজেকর্মে সহজেই টের পাওয়া যেত।

আর চারটি নঞর্থক বৈশিষ্ট্য আমায় বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ওদেশে আমার চোখে পড়ে নি চারটে জিনিস—বেওয়ারিশ কুকুর, পানোন্মত্ত ব্যক্তি, ভিখারি এবং পতিত জমি। সাধারণ স্বাস্থ্য চোখে পড়ার মতো। অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ছাড়া শীর্ণকায় ব্যক্তির দেখা পাই নি। দেখে ভালো লেগেছে ছোটো বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত প্রত্যেকে কাজ করছে। অর্থকরী কাজ ছাড়াও সমাজের পক্ষে উপযোগী কাজ বা সেবা সবাইকেই কিছু না কিছু করতে হয়। যার-যার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তারই।

অবশ্য প্রাচ্যজাতির স্বভাব একেবারে যায় নি। যেমন রেস্তোরাঁয় বসে জোরে-জোরে কথা বলে, শব্দ করে বাসনপত্র রাখে। কিন্তু অন্যদিকে আবার ওদের মধ্যে অতান্ত শৃঙ্খলাবোধ, কর্মভিত্তিক নৈতিকতা আর সততা দেখেছি। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে তরুণদের আড্ডা বা হইচই চোখে পড়ে নি। কাজ সারা হলে হয়তো গল্প করছে, কিন্তু অন্যের কাজের ক্ষতি করে নয়। ভারত সম্বন্ধে ওদের বন্ধুমনোভাব এবং কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু মনেহয় দীর্ঘকালের যোগাযোগের অভাবে সাধারণ চীনবাসীর মধ্যে ভারত সম্পর্কে বেশ কিছুটা অজ্ঞতা রয়েছে। হয়তো গুরুজীর পরামর্শমত দুদেশের মধ্যে কলা এবং সংস্কৃতিমূলক আদানপ্রদানকে কেন্দ্র করে যোগাযোগের নতুন ধারা গড়ে উঠলে অবস্থার উন্নতি হবে। মনে হয়, গুরুজীর এই সফর এরি মধ্যে দুদেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের সূত্রপাত করেছে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

সমাপ্ত

শহর সংস্করণ

শংকর বসু

সূর্য যখন প্রকৃতই মধ্যগগনে, তখন ক শহরের একজন পথচারীরও কোনো ছায়া সৃষ্ট হয় না। রোদ এই শহরে প্রচুর, প্রায় একমাত্র ঐশ্বর্য। তবু এইরকম খাড়া, নগ্ন সত্যের কোনো প্রভাব নেই। জীবন যাতে বেশ সড়গড় হয়ে যায়, কোথাও কোনো খিঁচ না থাকে, সেজন্য অফিস-কাছারি থেকে পিতামাতা-স্বামী-স্ত্রী-পুত্রকন্যা আর বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত, কপটতাকে প্রায় জল করে ফেলা হয়েছে। এবং আশ্চর্যের কথা, কিছুতেই এই জল ঘোলা হয় না, কেউ তাকে অস্বীকার করে না। সেইরকমই দর্শক ব্যাপারটি। সকলেই দর্শক, তারা দেখে যাচ্ছে শুধু নয়, আবার চিৎকার করে প্রচার করে যাচ্ছে এই বাণিজ্যিক দার্শনিকতা। রাষ্ট্র, সংগঠিত সংস্কৃতি, সম্পর্ক—সবকিছুই যেন এক নিসর্গ, যে নিসর্গের মধ্য দিয়ে একটি নিশ্ছিদ্র ভ্রমণ ঘুমের বড়ির মতোই সুখ-দায়ী। অমল, এক ছিন্নভিন্ন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে বেঁচে-থাকার অভিজ্ঞতার পর, এখন এসে দাঁড়িয়েছে সুখের একটি ফোয়ারার কাছে।

বাতানুকূল, খাড়া অফিসটিতে একদিন সে যে প্রীতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছিল, তা যে আসলে একজন দরিদ্র মানুষের সচ্ছল এবং কাল্পনিক সুখের প্রাসাদে প্রবেশেরই ঘটনা শুধু নয়, যোগ্যতা অনুসারে উপার্জনের অতি সাধারণ এবং স্বাভাব্যকর পরিমণ্ডল মনে মনে রচনা করে নেওয়া, এই সত্যটুকু ঐ প্রচার অফিস অজস্র স্পেসকে বিভিন্ন খুপরি, দরজা, গলি, দরজা আর খুপরিতে এমনভাবে চালান করেছে যে সে আর নেই। ঐ সরল সত্যটুকু নেই।

তার বদলে ছিল কয়েকজন কলিগ, দেখামাত্র মুচকি হাসতে হবে এমন গুটিকয় মুখ, বহুবার আলোচিত দু-চারটি বিবর্ণ বিষয় আর এক ধরনের বিষণ্ণতা। মাত্র দেড় বছরে, এখানে, একজন মানুষ, বিশ বছরের মেয়াদ খাটা কয়েদখানা টের পেতে পারে। অমলের ক্ষেত্রে যে ঠিক এরকম অনুভবই হয়েছিল তা বলা যায় না। অমলের একটি মুদ্রাদোষ আছে, সে থেকে-থেকেই নাক চুলকে নেয়। এই পুরনো মুদ্রাদোষটি গত দেড়-দু বছরে ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে। আগেকার শ্রম আর ক্লান্তির বিনিময়ে সে পেয়েছে প্রচ্ছন্ন অবসর। ফলে প্রকৃত অর্থে

কাজ নেই কিন্তু তার কাজের বাহানা এমন এক আঙ্গিক পেয়েছে, ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব এসেছে, লিখতে হচ্ছে অর্থহীন বাক্য, পরস্পরসম্পর্কহীন তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে এবং গোটা জিনিসটাকে এমন এক অলীক সহজতায় উপস্থাপনা করতে হচ্ছে যে সে-সবের পৌনঃপুনিক ব্যবহার খুঁটিয়ে দেখলে, পাওয়া যাবে বড়োজোর হাজার খানেক শব্দ। এমনকি ভাষায়ও এসেছে ব্যাপক মুদ্রাদোষ।

প্রায়ই তার কলিগ থেকে সম্পাদক পর্যন্ত, কেউ না কেউ বলবেই 'আপনার স্টাইলটা দারুণ', 'নাম না থাকলেও বোঝা যায় আপনার লেখা', 'আচ্ছা, আগেকার লেখা তো এত সড়গড় হত না', 'এ যেন জলের মতো।'

জল যে কত বিধ্বংসী হতে পারে, অমল অনুভব করে নি। দৃশ্যত জল বড়োই নিরীহ, ঠান্ডা। বরং সে আগুন হলে বুঝতে পারত, আগুনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, যদিও ততটুকু দূরত্ব ছিল যাতে আগুন প্রতিহত করা যায়, আগুন অভ্যাস না হয়ে যায়।

বুঝলে অমল।

ব-লু-ন!

শহরে এখন বাড়ি করার ধুম পড়েছে।

হ্যাঁ, দেখছিলাম।

ব্যাঙ্কে চাকরি নাও আর বাড়ি বানাও, বুঝলে।

শুধু ব্যাঙ্ক কেন।

তা অবশ্য ঠিক, শুধু ব্যাঙ্ক কেন।

পরমুহূর্তে তারা সরে যেতে পারে বিষয়ান্তরে, একের পর এক নেতি দিয়ে ছোট্ট যেন 'হ্যাঁ' শব্দটি গড়ে তোলে, তাতে এই জীবনের প্রতি ভয়ংকর একটি 'না' উপহার দেওয়া সম্ভব হয়, এমনও নয়। বরং নিজেদের শরীরের রক্তের মধ্যে, ধীরে, ডুবে যেতে থাকে, রক্তের উষ্ণতার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই ইন্দ্রিয়ময়তারই প্রচারকেন্দ্র অফিসটি, যা নাৎসিরেডিওর কোন কুখ্যাত ঘোষকের কণ্ঠস্বর নয়, কারণ 'স্বাধীনতা' 'ভালোবাসা' ইত্যাদি শব্দও রোজ ছাপা হচ্ছে। নাৎসি রেডিও থেকে কি ঐসব শব্দ ছেঁটে ফেলা হয়েছিল? সম্ভবত না।

আচ্ছা, এই প্রচারের ব্যাপারটা...

কোন প্রচার বলুন তো।

ইয়ে, মানে প্রচার অ্যাজ সাচ...

ভ্যা...ভ্যা...ভ্যা...

আর-একদিন হয়তো কথাবার্তা বদলে গেল একটু— 'হ্যাঁ মশাই, গণতন্ত্র তো একটা পরিভাষা, তাই নয় কি', 'সে তো বটেই', 'অবশ্য শব্দটা আমার কাছে কেমন ছবি হয়ে আসে', 'শুধু আপনার কাছে কেন, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের কাছেই, আপনার কি আলাদা ছবি', 'হ্যাঁ হে, আমার ছবিতে দেখবে শুধু এক সাইজে নিয়ে আসা গাদা-গাদা বেঁটে লোক', 'আপনি মশাই ফ্যাসিস্ট'।

এভাবে ইয়ার্কি, হালকা আর গভীর কথাবার্তার প্রতিটি দিনের, কোনো ঘটনাগত দিনপঞ্জী রচনা অসম্ভব। হয়তো কুড়ি-তিরিশ দিনের একটি অনুচ্ছেদ লেখা যেতে পারে। তাও আবার বড়োজোর তিন-চার বার। কেননা, জীবনের দিক থেকে ভাবলে শহরটি ছিল অসম্ভব রকম বন্ধ্যা, ব্যক্তিরা হয়ে পড়েছিল সৃষ্টিবিহীন। আর ঐ মরুভূমিতে, মুখস্থ কথার, অনুভবহীন প্রসারিত হাতের মধ্যে তবু যেন ফুটে যাচ্ছে অজস্র কমল, এইরকম তাদের বিশ্বাস। 'গণতন্ত্রে নায়কের কোন স্থান নেই' তারা বলেছিল আর অমল ঐ বাক্যটিকে তৎক্ষণাৎ জাপটে ধরে। ভাবে, এখানে আজও উষ্ণতা আছে। তারপর তাকে জেনে যেতেই হয় যে একজন নায়কের মৃত্যু হল দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের মৃত্যু। এবং এরকম একটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ পেতে পারে বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর, কিন্তু সে প্রান্তরে জ্যান্তো মানুষ ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। তা নিছক আরাম বা সুখ নয়, অভিজ্ঞতার এক তরঙ্গমালা। দুর্ভিক্ষ নিয়ে অমলের ভয়ার্ত চিন্তা এখন আর নেই যেমন, তেমনি দুর্ভিক্ষ নিজে সরে গিয়ে পৃথিবী শস্যশালিনী করে তোলে নি। বরং উন্মুক্ত আকাশের নীচে, খোলা দিগন্তগ্রাসী প্রান্তর শুধুই মৃতের হাড়। এবং এই প্রান্তরটি, শহর লুকিয়ে ফেলেছে নাগরিকগণের টুপির তলায়।

ছয়

এভাবে, একবার সমস্ত চিত্রময়তা আর প্রমাণ বিলুপ্ত করে দুর্ভিক্ষ বিমূর্ত হয়ে যাওয়ার পরই প্রকৃত অর্থে অমল ভুলে যেতে পারে ক শহরের ঐ গভীর ক্ষতটি, যেখানে যন্ত্রণার মধ্যে নত বিক্ষুব্ধ প্রাণ ছিল, ছিল অতিকোমল, অন্তহীন স্পন্দনের আঁকাবাঁকা ঢেউটি।

মোহিত দাশ আজ ভোরের ট্রেন ধরেছে, সে উঠেছিল প্রায় মধ্যরাতে। মোহিতের মালপত্তর যত কমই হোক, সব একা সামলাতে হচ্ছে বলে পরিশ্রম কম নয়। মোহিতের ঘরে কয়েকখানা বইও ছিল। ইশতেহার আর রূপকথার গল্পের বই তো সব সময়ই থাকত। এ ছাড়া একজন মানুষের শোওয়া-বসা-খাওয়ার জন্য যতটুকু জিনিস না হলে চলে না সবই ছিল ভাঙা দেওয়ালের লম্বাটে ঘরটিতে। ঘরটি একটু বেয়াড়া রকম লম্বা বলে, ঐ ঘরে মোহিত এত বেশি স্পেস পেয়ে যেত যে, পায়চারির অভ্যাস গড়ে তুলতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত।

বিশাল এই বাড়িটির অতিবিশাল জীর্ণতা থেকে মোহিতের চলে যাওয়া অভ্যাসবশত কিছুটা করুণ রস সৃষ্টি করেছিল। মোহিত চলে গেল বলে মোহিত সম্পর্কে সকলেই দু-চার কথা বলছিল, বলবেও, এক ঐ পল্টু ছাড়া। পল্টু আসলে বাড়িটিতে থাকেই না, একমাত্র খেতে আসা আর রাতের ঘুমের সঙ্গেই পল্টুর কাছে বাড়িটির যতটুকু অস্তিত্ব। সে বাড়িটিকে ব্যবহার করে শুধু।

মোহিত বিন্দুমাত্র বিমর্ষ হয় নি, সে চলে গেছে একজন বিশ্বাসী মানুষের মতো, সম্পূর্ণ অ-নাটকীয়ভাবে, এমনকি নাদু মিত্তিরকে বলেছিল খুবই বাস্তবসম্মত একটি কারণ। কারখানা লক-আউট হয়ে গেছে, কবে খুলবে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, বহুদূরে একটি খনিতে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে মোহিতের ভাব আছে। সে সেখানেই চলেছে।

মোহিত কেন যে তার গোপন কথা অমলকে বলে যায় সে এক বিস্ময়। আবার মোহিতের গোপন কথা জানার পর অমল আশ্চর্যরকম দায়িত্ব অনুভব করছে। ঠিক এরকম কোনো অনুভূতির অভিজ্ঞতা অমলের ইতিপূর্বে ছিল না। সে, বলা যায়, এমন অনুভূতির সন্ধানই জানত না।

হয়েছে কী, মানে, মন লাগছে না।

কিন্তু যেখানেই যান...

তবু, আমি শহরটাকে সহ্য করতে পারছি না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, এমনকি ঘুমের মধ্যে, কেমন যেন গিলে ফেলছে আমাকে।

কমরেডদের সঙ্গে কথা বললেন?

না।

সে কী!

তাহলে বলি, একটা পার্টির দু-চারজন নয়, হাজার-হাজার কর্মী আছে। আলাদা-আলাদা ভাবে তারা নিজের-নিজের মতো করে দলের মত, পথ এসবে বিশ্বাস করে।

হুঁ।

কিন্তু গোটা জিনিসটা যদি শেষ পর্যন্ত ঐ হাজার-হাজার থেকে আলাদা একটা শক্তি হয়ে ওঠে, মানে ধরুন, পার্টিটা হয়ে গেল মাথা, আর আমাদের মাথাগুলো কেটে ফেলা হল...

ভয়ংকর।

এখন, আমি কার সঙ্গে কথা বলব?

তাই বলে...

এখানে থাকলে রোজই আমাকে এইসব দেখতে হবে, নিজেকে মনে হবে হেরো, নাহয় ঠকে-যাওয়া লোক, আমি মরে যাব। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস তো ভাঙে নি, মুখস্থ বুলি আউড়ে যাওয়ার অভ্যাসও হয় নি। বরং পঁয়তাল্লিশ বছর প্রত্যেক দিন, তিল-তিল করে আমিই ছড়িয়ে গিয়েছিলাম অনেকের মধ্যে। মারধোর, অপমান, জেল...। এখন এই ছড়িয়ে-পড়ার গোলমালটা বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস ভাঙে নি। প্রোগ্রামের ব্যাপারে এখন সন্দেহের সঙ্গে ভয়ও এসেছে। প্রচার বড়ো সাংঘাতিক জিনিস, তা সে বুর্জোয়া কাগজই করুক কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি। এতে যন্ত্র লাগে দাদা। যেভাবে, ধরুন, টুবাইকে আপনি জেনেশুনে মিথ্যে বলতে পারবেন? না জানলে চুপ করে যাবেন, ওর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি মনে হয়, না, বরং এ জিনিসটা টুবাইর ঠিক সময়ে নিজে-নিজে বুঝে নেওয়াই ভালো, তাহলে এড়িয়ে যাবেন, এই ভালোবাসাটা...

মোহিত দাশের অবিবাহিত জীবন, সম্পূর্ণ একা-একা বেঁচে থাকাই হয়তো তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে ভালোবাসার তীব্র আগুন। তবু মোহিত যখন একজন মানুষের হাতে নিজের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের তাপ ঘন স্পর্শ রেখে যেতে চাইছে তখন তাকে প্রশ্ন করা একরকম বাধা দেওয়াই, অমল তা করতে পারে না।

আমি জানি না ঠিক কী ভাবে বলা যায়, ধরুন, স্বপ্নের কথা, স্বপ্ন আর প্রোগ্রামের মধ্যে...

সম্পর্ক...

হ্যাঁ, সম্পর্ক, গোলমাল লাগে, বদমাইশি আছে, তবে সেটা তেমন কিছু নয়, আসল গন্ডগোল ঐ স্বপ্ন আর

কর্মসূচীর মধ্যে সোজা কোপ মারা হয়েছে, মানে...

ব্যবধান...

ব্যবধান কী বলছেন—দুটো আলাদা জগৎ...

আপনি একা কী...

কী করতে পারব আলাদা কথা...

মোহিত দাশ ঐ আলাদা কথাটি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু ভাবে নি। সে ঐ ব্যাপারে তেমন টানই অনুভব করছে না। সে শুধু ভাবছে, তার শরীর-মন-অস্তিত্ব দিয়ে ভেবে যাচ্ছে একটি ধ্বংসস্তূপের কথা। এই ভাবনায় রোমন্থন কিছু নেই, বরং তা তাকে দুর্দান্ত চঞ্চল করে তুলেছে। শোকসন্তপ্ত মানুষ আর উন্মাদপ্রেমিক মানুষের এক সমন্বয় ঘটেছিল মোহিত দাশের মধ্যে। সে চলে গেছে। ঘরটিতে এখনও তালা লাগানো হয় নি, সেখানকার বাতাসে মোহিতের বসবাসের গন্ধও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি, তবু এখন তা শুধু একটি ঘর, স্পেস, আলো, অন্ধকার আর গন্ধ।

সাত

সল্ট লেকের একটি ব্লকের বিস্তৃত মানচিত্রসহ লেফাফাটি উড়ে এল। অমল বিস্ময়ে লক্ষ্য করল সে বেশ কৌতূহল অনুভব করছে। কে. এস. স্ট্রীটের সাতসেঁতে বাস্তবতা থেকে, বা সেটির তুলনায় তার পরিবার যে সুবিধে-ভোগীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে নয়, আসলে তারা হয়ে উঠেছে, পরিবারটিতে তিনজন অফিসজীবী থাকাই এর কারণ। এখন এটি একটি পরিস্থিতি, এতে আড়ষ্ট বোধ করা, আসলে যা এক ধরনের পাপবোধ, অমল কতক্ষণ আর ঐ কুঁকড়ে-যাওয়াকে প্রশ্রয় দিতে পারে। বরং মনে হল এ বিষয়ে তার দু-একটি কাজ এবার করে ফেলা দরকার—এক, নাদু মিত্তিরকে জানানো ; দুই, ইন্দর পরিচিত ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা। অবশ্য, সে বিষয়েও নাদু মিত্তিরের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার।

ঊর্মিলার মুখে এতখানি উল্লাস এসে যায় যে যেদিন সে এককাপড়ে চলে এসেছিল, সেইরকম নমনীয় লাগে তাকে। সেদিনও ঐরকম লেগেছিল, তবে অমল নিজেও সেদিন আবেগের শীর্ষে ছিল বলে টের পায় নি অত-খানি উচ্ছ্বাস। ঐ নমনীয়তা আসলে ছিল এক কাল্পনিক জগতে প্রবেশ করতে পারার অনির্বচনীয় আনন্দ। তীব্র আকাঙ্ক্ষার এক মাধুর্যময় পরিণতি। ঊর্মিলা বিধুবালাকে কী যেন খাওয়ার ব্যাপারে পীড়া-পীড়ি করছে, সুভদ্রা স্নান সেরে এল, সারা গায়ে ভিজে কাপড়, অমল যেন বহুদিন পর সুভদ্রার মুখ দেখল। সুভদ্রার মুখটি এক কথায় কুণ্ঠিত, যদিও প্রকৃতি তাকে উপহার দিয়েছে সুন্দর শরীর। টুবাই ওঁদিকে খাবলে ধরেছে দাদুর বুকের একগুচ্ছ সাদা চুল। এইরকম পারিবারিক দৃশ্যের নিজস্বতাই এখন অমলের কাছে জেগে উঠছে, সে ভাবতে পারল, শুধু এইটুকু, পৃথিবীরই এক অণু-সংস্করণ, অণুপৃথিবী, ঊর্মিলা এককাপড়ে চলে এসেছিল এমনই একটি পৃথিবীতে। প্রতিদিনের জীবনে এখানে কিছু অভ্যাস নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে, তবে সেসব অভ্যাসের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আর অভ্যাসের মধ্যেই সবাইকে কবর দেওয়া হয়েছে ভাবার মধ্যে আর যাই থাক ভালোবাসা নেই।

এই সংকীর্ণ পরিসরে পাঁচজন বয়স্ক মানুষ গাদা-গাদি করে থেকেও পরস্পর পরস্পরকে খুব কমই অনুভব করেছে। আর এই অভাবটা পুষিয়ে গিয়েছিল আস্থা আর বিশ্বাসে। দেওয়াল যতই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তাদের ওপর, অন্ধকার খাবলে নিয়েছে তাদের মুখ, চোখ, বুক, দাঁত নেমে এসেছে, সিলিং-এর নোনাধরা ঢেউ, ঝুরঝুর করে খসে-পড়া দেওয়াল—এসবই বেঁচে-থাকার মৌল উপাদানসমূহকে এত বেশি তীব্র করে তুলেছিল যে ভালোবাসার জন্য পরস্পরের মুখের দিকে তাকানোরও কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি তারা।

এর মধ্যে ছিল নিরাপত্তার প্রকট অভাব। ক শহরের হাসপাতালের ওপর তারা নির্ভর করতে পারত না ব্যাধির প্রশ্নে, কিন্তু এমন আর্থিক সংগতি ছিল না যাতে স্ত্রী-বোন-মা-কে নামজাদা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। অমলের একার এক অ-নিয়মিত উপার্জনে তাদের প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল অনিশ্চয়তার বিশাল একটি বেদীর উপর। এই চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা তাদের বড়ো সংবন্ধ রেখেছিল, ভালোবাসাকে ঘিরে রেখেছিল শঙ্কা। ভয় হত, হঠাৎ যদি কিছু হয়, কেউ যদি হঠাৎ...

সুখের যে বাতাস বহু ঘরপথ অতিক্রম করে, পাতা উড়িয়ে, পরিষ্কার প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করল, আজই তা লাভ করেছে এক তীব্র প্রত্যক্ষ রূপ। এখন তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে পারবে, এই তাকানোয় আর কোনো ভয় বা প্রত্যাশা না-ই থাকতে পারে। হতে পারে, আবার তাদের পরস্পরকে টের পেতে হবে নতুনভাবে, কেননা আর কিছু না হলেও তাদের বাস্তব স্বাধীনতা তো অনেকটাই প্রশস্ত এখন। কোনো কারণে ঊর্মিলা যদি সুভদ্রা বা বিধুবালার সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক হয়, সে এবার দরজায় খিল দিতে পারবে। কারুর ঘুম না ভাঙিয়ে বিমলবাবু ভোররাতে নিজের জন্য এককাপ চা করে নিতে সক্ষম হবে, অমল একটি ফোন করে জানিয়ে দিতে পারবে, 'আজ ফিরছি না।'

[ক্রমশ

জাহাজী গল্প

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

গণপত একদিন খবর নিয়ে এল যে তার সেই যাত্রার দল (সে অবশ্য বলত অপেরা) কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে এসেছে। অনেককাল আগে আই-পি-টি-এর কল্যাণে মফঃস্বলে-থিয়েটার-করা শিক্ষিতাদের দেখেছিলাম। তাদের সঙ্গে তুলনা করার জন্যে যাত্রায় যেতে আগ্রহ হল।

শনিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর গণপত দুটো সাইকেলে রওনা দিলাম। ক্যানটনমেনট ছাড়িয়ে অন্ধকার রাস্তায় এক ঘণ্টার উপর চলে বড়ো রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে পৌঁছনো গেল। অভিনয় তখন শুরু হয়ে গেছে।

শেষ হতে গণপত যখন তার মালকিনের কাছে হাজির করল তখন রাত গভীর। মনে করেছিলাম, গম্ভীর, দশাসই, মাসিমা-গোছের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। দেখলাম—তন্বী এক মহিলা। বয়স বেশি নয়। রঙ ময়লা। মুখে হাতে তখনও থিয়েটারের রঙ। জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে সকলে তখন শোবার ব্যবস্থা করছে। দিনের বেলায় সেটা বোধহয় চায়ের দোকান—এখন এদের রাত কাটাবার জায়গা।

ঝাঁপফেলা দোকানের বাইরে দুটো বেনচি জুড়ে পেতে দিয়ে গণপত বললে, "বাতচিত করুন। তারপর নিদ লাগলে এখানেই শুয়ে পড়বেন। ভোর হলেই আমরা ফিরে যাব—বাইরে আপনাদের করনেল সাহেবের হুকুম বিনা রাত কাটানো মানা।" নিয়মটা জানতাম না। ভাবলাম, আগে জানলে হুকুমটা নিয়েই নিতাম।

মহিলাটি বসে জিগ্যেস করলেন মামুলি সব প্রশ্ন—শো কেমন লাগল, আমি মরাঠি বুঝি কিনা, পুনায় কত দিন আছি। এরকম দু-চারটে প্রশ্নোত্তরের পর চুপ-চাপ। অচেনা এক মহিলার সঙ্গে অন্ধকারে বসে কী বা কথা বলা যায়।

চুপচাপ বসে থাকার অস্বস্তি কাটাতে আরেক প্রস্থ এলোমেলো কথা শুরু হল—বাঙলায় থিয়েটার কেমন হয়, কলকাতায় কটা অপেরা আছে, অভিনেতাদের মাইনে কেমন, বাঙলায় প্রত্যেক মেয়েই নাচগান শেখে কিনা, ওখানে গ্রামে-গ্রামে 'ভাট' আছে কিনা, পৌরাণিক ছাড়া কোন কোন 'বীরগাথা' গ্রামে গাওয়া হয়?—এইরকম সব প্রশ্ন। লক্ষ করলাম, বিদুষী না হলেও মেয়েটি বেশ চৌকশ। আমার প্রশ্নগুলো হল কতকটা ব্যক্তিগত—জন্ম

থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে যোগ কিনা, থিয়েটার ভালো লাগে কিনা, নিজস্ব দল থাকার সুবিধা, স্বামী এখন কোথায়, মেয়ে হয়ে থিয়েটার—তাও আবার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার—চালাতে সমস্যা কী কী, এইসব কথা।

উত্তরগুলো থেকে জানা গেল—বিদর্ভ অঞ্চলের এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। লেখাপড়ার সঙ্গে একটু গান, একটু নাচ শিখত। সেই সূত্রেই ছেলেটির সঙ্গে পরিচয়। ছেলেটির বাবার 'কোমপানি' ছিল—থিয়েটার অপেরা করত। মামুলি স্বদেশীর গন্ধ পেয়ে পুলিস যখন সেটাকে বন্ধ করে দেয়, তখন থেকেই শ্বশুর দল নিয়ে গ্রামে-গ্রামে নাচগানের শো দিত। ছেলে সেটা কখনও পছন্দ করত না—সে কেবল চাইত ভালো করে বেহালা বাজাতে। তার কথা উঠতে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "কী সুন্দর হাত ওর, না শুনলে বুঝবেন না। ও যখন পিলু বারোয়াঁ বাজাত, এমন উদাস হয়ে যেতাম যে ইচ্ছে হত আমার সব-কিছু দিয়ে ওর পালানো মনকে টেনে ফিরিয়ে আনি। যখন হিন্দোল বাজাত, মনে হত যেন ঝুলায় চড়িয়ে সে আমায় সোহাগে জড়িয়ে জীবনে পূর্ণতা এনে দিচ্ছে। তখন তো বয়েস খুব অল্প, ঘর ছেড়ে তাকে বিয়ে করে চলে এলাম। আমার বাড়ির লোক তাদের এ লজ্জা কোনো দিন ভুলতে পারে নি। আর এখন তো বাপ-মা মরেই গেছে!

"শ্বশুর আমাকে আদর করে নিল। বললে, আমার কপাল খুব খারাপ, ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে—নইলে ওই পাগলকে বিয়ে করে কেউ! সত্যিই আমার নসিব বদ—কিছুদিন পরেই শ্বশুর মরে গেল। ওর ছেলে তখন কোমপানি বেচে দিতে চাইল। এই সিনেমার যুগে কে নতুন করে এ ঝামেলা ঘাড়ে নেয়। ওর মন পড়ে থাকে বেহালায়, এসব ও পারে না।

"তখন চালাবার ভার আমি নিলাম—ওর বাজনা শেখার খরচটা তো জোগাতে হবে। বম্বে থেকে ওকে ডেকেছিল। বাজনার দলে গেল না। বললে ও বাজে বাজনা। নৌসেনার ব্যান্ডপার্টিতে ঢোকবার আশা ছিল, কিন্তু সেখানে অন্য যন্ত্র বাজাতে হবে শুনেই হটে এল। এখন গেছে লখনউয়ে তালিম নিতে, আর আমি ঝামেলা সামলাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। হাই উঠছে, সেটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছি। মেয়েটি কথা বলতে-বলতেই কী যেন ঘষে-ঘষে রঙ তুলছিল। বলল, "আপনার বেশ কষ্ট হল। দেশবিদেশের কত বড়ো-বড়ো থিয়েটার দেখেছেন। আমাদের এসব দেখে হাসি পেয়েছে হয়তো। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে যে বাইরের জগতের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। কাল আমাকে চিনতেন না, আগামী কালও হয়তো অন্য জায়গায় চিনতে পারবেন না। আপনার কাছে তাই স্বীকার করছি—আর পারছি না। গোড়ায়-গোড়ায় মনে হত, ভালোবাসার জন্যে কষ্ট করার চেয়ে আনন্দ কিছু নেই। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে—ওর কাছ থেকেও আমি দূরে সরে যাচ্ছি। আগে মনে হত, ও যে এত কষ্ট করছে, তা তো কেবল আমারই জন্যে। এখন কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হয়, ও কষ্ট করছে নিজের অন্তরের তাগিদে। তার কাছে আমি আর অন্য মেয়েতে কোনো তফাত নেই। তবু ও আমার স্বামী—আমার তো যাবার অন্য জায়গাও নেই।" বলতে-বলতে গলা ভারি হয়ে এসেছিল। এবার চুপ করে গেল। হয়তো কান্না চাপতে।

বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল। মনে হল, তফ্‌নি যেন গণপত এসে বলছে, 'সাব চলিয়ে।' চোখ খুলে দেখি, সাইকেল দুটো নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে অন্ধকার যে একটুখানি পাতলা হয়েছে, তাকেই আড়াল করেছে গণপতের মূর্তি। মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না। ভীমা নদীর পাশে পাথরে বাঁধানো উঠোনের মধ্যে মস্ত বড়ো একটা যে থাম দেখা যায়, সেটার পাশ কাটিয়ে কোরেগাঁওতে যখন পড়লাম, অন্য তারাগুলি মিলিয়ে তখন ভোরের তারাটি কেবল জ্বলজ্বল করছে।

চলতে-চলতে গণপত তার বিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফল যেন জানাচ্ছে, এমনি গম্ভীরভাবে বললে, "মেয়েরা বড্ড বোকা হয়।" আমার সাড়া না পেয়ে নিজের মনেই বলে চলে, "যারা ওখানে কাজ করে তারা কেবল মেয়েটার জন্যেই আছে। মাইনে কম, খাটুনি বেশি—তবু পড়ে আছে। মেয়েটা যতটা পারে টাকা স্বামীকে পাঠায় আর সে ছোকরা মদ গাঁজা খেয়ে কী করছে খবর তো পায় না। তবে হাঁ, বেহালা ছেলেটা বাজায় বড়ো ভালো। ওসব ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা।"

মেসের ঘরে যখন পৌঁছলাম, তখন রবিবারের ঝিম-ধরা সকালে লোকজনের ঘুম সবে ভাঙতে শুধু করেছে।

সে রাতের অভিযানের কথা কেউ জানতেও চায় নি, আমিও বলি নি।

মঙ্গলবার ট্রেনিঙ অফিসার মেজর নীলকণ্ঠের কাছ থেকে ডাক এল।

নীলকণ্ঠের আমরা নাম দিয়েছিলাম বোল্টম সাহেব। দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণ—মাছ মাংস বিড়ি সিগারেট মদ কিচ্ছু খান না, কিন্তু মেজাজে চালচলনে পাকা সাহেব। অনেক বার অবাক হয়ে দেখেছি—কী পরিপাটিভাবে কাঁটা-ছুরি হাতে ডাল-তরকারি দিয়েই হাতরুটি খাচ্ছেন। ক্লাস ছাড়াও আমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝেই আলাদাভাবে ডেকে কথা বলতেন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন।

মেজরের দপ্তরে হাজির হতে অন্যান্য বারের মতো হেসে 'বোসো' বললেন না। আর বসতে না বললে যে বসতে নেই, সে জ্ঞান ততদিনে হয়েছে বলে দাঁড়িয়েই রইলাম।

তিনি গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, "শনিবার রাত্রে তুমি ব্যারাকে ছিলে না?"

"না।"

"কোথায় ছিলে?"

"কোরেগাঁওয়ে।"

"কোনো বিশেষ জরুরি কাজে?"

"না, থিয়েটার দেখতে।"

মেজর সাহেব মুহূর্তের জন্যে যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,—"বিখ্যাত কেউ অভিনয় করেছিলেন?"

"না।"

"তবে হঠাৎ বিনা অনুমতিতে গেলে কেন?"

"অনুমতি নিতে হয় জানতাম না।"

"তুমি কোনো বিপদে পড়লে আমরা টের পেতাম কী করে?"

"বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"ওঃ।" একটু থেমে প্রশ্ন করলেন আবার, "ওখানে নদীর ধারে উঁচু একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে, দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"পড়ে দেখেছ সেটায় কী লেখা আছে?"

"হ্যাঁ, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি ক্যাপটেন ফ্রান্সিস স্টর্টনের অধীন বম্বে সিপাহিদের ছোটো একটি দল খোদ পেশোয়ার অধীনে বিরাট মরাঠা বাহিনীকে রুখে দিয়েছিল। বম্বের সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের এটি একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। বুঝেছ? দু-দলেই ছিল একই ধরনের পলটন—ছোলাছাতু-খাওয়া মরাঠি। কিন্তু ফয়দাটা ওঠাল ইংরেজ। এর কারণ কী মনে কর?"

বললাম, "ডিসিপ্লিন।"

"কেবল তাই?"

"তবে? আর কী?"

"পেশোয়ার দলে নেতৃত্বের অভাব। ইচ্ছে করলেই নেতা হওয়া যায় না। খুব ত্যাগী বা গুণী হলেই যে নেতা হতে পারবে, তাও নয়। নেতা হওয়ার জন্যে ধাপে-ধাপে শিক্ষা নিতে হয়, ধাপে-ধাপে উঠতে হয়। সেই-জন্যেই সব দেশের ইতিহাসে দেখবে এক রাজবংশ গিয়ে আরেক রাজবংশ এসেছে। আর, এই বিষয়ে নেতা হলেই সে সব বিষয়ে নেতা হবার যোগ্য হয় না। পেশোয়া কূটনীতিতে ওস্তাদ হলেও যুদ্ধনীতি বুঝতেন না।"

আমি ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করলাম, "যদি বলেন, এক-এক বিষয়ে এক-এক নেতা, তাহলে তো সেই চতুর্বর্ণ জাতের সমর্থন হয়ে পড়ে—ধর্মের বেলা ব্রাহ্মণ, যুদ্ধের কালে ক্ষত্রিয়—"

মেজর সাহেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বললেন, "এসব আলোচনা পরে কোনোদিন হবে। তোমায় যেজন্য ডেকেছিলাম—কানুন না-জানা কোনো অজুহাত হয় না, পলটনে তো নয়ই। তবে, আমার মনে হয়, তুমি আসলে ওই স্মৃতিস্তম্ভটাই দেখতে গিয়েছিলে. এবং ধরে নিচ্ছি, রাত হয়ে যেতে ফিরতে পার নি। এরকম আর কখনও কোরো না। আর হ্যাঁ, যার অভিনয় দেখেছ বললে, তার নাম কী?"

খেয়াল করেছিলাম, সে রাতে মেয়েটি তার স্বামীর নাম একবারও উচ্চারণ করে নি। এখন মনে করে দেখলাম, নিজের নামও সে বলে নি।

মেজর সাহেবকে বললাম, "জিগ্যেস করি নি, কেউ বলেও নি। মোট কথা, মনে নেই।"

তিনি মিচকে হেসে প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, "এতেই প্রমাণ হয়, আমার ধারণাই ঠিক। তুমি যেতে পার।"

[ক্রমশ

গ্রন্থসমালোচনা

An Acre of Green Grass : a Review of Modern Bengali Literature—Buddhadeva Bose. Papyrus. Rs. 25

বুদ্ধদেব বসু-রচিত এই গ্রন্থখানি প্রথমে ওরিয়েন্ট লংম্যানস-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। সেই প্রথম প্রকাশনের ৩৪ বৎসর পরে বই-খানার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে ১৯৮২ সালে। গ্রন্থের মূল পাঠ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এই সংস্করণের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ কয়েকটি সহায়ক কথা বলেছেন। সেসব কথা বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক পাঠকগণ সহজেই বুঝবেন। এই গ্রন্থে ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে। পরিচ্ছেদগুলির বিষয় হচ্ছে ১. রবীন্দ্রনাথ, ২. প্রমথ চৌধুরী, ৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪. নজরুল ইসলাম, ৫. আধুনিক বাঙলা কবিতা, ৬. আধুনিক বাঙলা গদ্য। এই ছয়টি অধ্যায়ে অনেক কথা, অনেক মূল্যবান গভীর সাহিত্য-সংবেদনা-পূর্ণ মতামত বিধৃত আছে, সেসব মূল্যবান কথার ভগ্নাংশের বেশি বর্তমান রিভিউয়ে স্থান-সংকুলিত করা সম্ভব নয়। বর্ত-মান রিভিউয়ে অতএব সীমিতসংখ্যক প্রবন্ধের উপরেই ওজন দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকেই শীর্ষে রেখে অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

এককালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠকগণের অভিরুচি ছিল দু ধরনের। দু ধরনই ছিল আইডলাট্রাস। এই ধরন দুটিকে বুদ্ধদেব বলছেন,

two popular versions...two Rabindranaths Made Easy, one in prose, and the other in verse.

বুদ্ধদেব বসুর এই রসিকতা গ্রাহ্য নয়, পপুলার হলেই যে মেড-ইজি হয়, সোজা লাইন হয়, সাদাসিধে হয়—এমন চিন্তা টেকসই নয়। পপুলার তো ছিলেন সফোক্লিস, দান্তে, শেকসপিয়র, গোয়েটে, টলস্টয়। কিন্তু তাঁদের জন-প্রিয়তা (যে জনপ্রিয়তা আজো অব্যা-হত, অক্ষুণ্ণ আছে) কোনোরকম তির্যক শ্লেষের বিষয় হয়ে ওঠে নি। এই অনা-বশ্যক শ্লেষটিকে বাদ দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বাকি কবি-আলোচনা কয়টি গ্রাহ্য, এবং অধিকাংশই মাননীয়। তিনি রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন মোহিতলাল মজুমদারের নাম, নজরুল ইসলামের নাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম, জীবনানন্দ দাশের নাম। জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের কাব্য-চেতনা সূক্ষ্ম এবং গভীর। তিনি বলছেন, জীবনানন্দ ছিলেন,

A Nature worshipper, but by no means a platonist or pantheist; he is rather a pagan who loves the things of nature sensuously, not as tokens or symbols nor as patterns of perfection, but simply because they are what they are. Not content with mere seeing, he must possess nature through the more savage senses of touch and smell.

(অর্থাৎ, জীবনানন্দ ছিলেন নিসর্গ-উপাসক, কিন্তু তথাপি প্লেটোপন্থী ছিলেন না, তিনি নিসর্গের প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে তাদের সত্তাগুণে দেখতে পেতেন। শুধু দেখেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, দেখার সঙ্গে মেলাতেন স্পর্শ এবং গন্ধের মতো আরো জান্তব ইন্দ্রিয়-চেতনা।) বুদ্ধদেব বলছেন যে জীবনানন্দ শুধু পাখির গানই ভালোবাসতেন এমন নয়, হাত-ধোওয়া জলের উষ্ণ স্পর্শও ভালোবাসতেন, যেমন বাসতেন আমে-রিকান কবি ওয়ালট হুইটম্যান। এহেন কবি-সংবেদী বুদ্ধদেব (তাঁর এই গ্রন্থে এবং অন্যত্র) দেখতে পেয়েছেন অনেক কবির রচনায়, বিশেষত নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর রচনা-শৈলীতে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত (এবং রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বজ হুইটম্যানের কবিতায়) গদ্যছন্দের অবয়ব-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, ফর্ম সম্বন্ধে। ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথ এই ছন্দের লেখা লিখে-ছিলেন বেশ কিছু। এই ছন্দে তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু গভীর দ্যোতনা-সম্পৃক্ত কবিতা বেরিয়েছিল 'কল্লোল' পত্রে। অব্যবহিত পরে আবি-র্ভূত হলেন সমর সেন যাঁর গদ্যকবিতার তীক্ষ্ণ গভীর সুর-বৈচিত্র্যে আমরা—সেকালের তরুণ পাঠকেরা—উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছিলাম। সেকালীন আমে-রিকান, ফরাসি, আইরিশ কাব্যছন্দের সঙ্গে নিজ ভাষায় নবীন ছন্দের মিলন-সাধন করা বড়ো ছান্দসিকের লক্ষ্য, সে লক্ষ্য সমর সেনের কাব্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। এই কালেই চিন্তা করে-ছিলেন কিছু বাঙালি কবি 'অবনত ভারতের' বিষয়ে, এই কালেই এক কবি বললেন, তিনি কবি যত কামারের, কুমোরের, ছুতোরের, (ইংরেজিতে যাকে বলে দ্য হ্যান্ডস অ্যান্ড হ্যান্ড-নটস) সেইসব শীর্ণ, সমাজ-ক্লিষ্ট মানুষের কথা বললেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, মণীশ ঘটক, জীবনানন্দ দাশ (যিনি শূন্যতে পেয়ে-ছিলেন ইতিহাস খুঁড়ে রাশি-রাশি দুঃখের খনি)।

বুদ্ধদেব লক্ষ করেছেন যে আধুনিক মানুষের সভ্যতায় ভূগোলবোধ কী ভাবে সক্রিয়। এই প্রসঙ্গে দুজনের উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হয় : প্রেমেন্দ্র মিত্র,

অমিয় চক্রবর্তী। বুদ্ধদেব বলছেন, এই ভূগোলবোধের উৎস হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের কবি সমগ্র পৃথিবীতে প্রচুর ভ্রমণ করেছিলেন তথাপি তাঁর রচনায় সেই ভ্রমণের ছায়াপাত বিশেষ হয় নি, যেটুকু হয়েছে সেটুকু ডায়েরির নকশায় হয়েছে। বুদ্ধদেব বলছেন, ঠিক কথাই বলছেন যে, কবি তাঁর কাহিনীর ঘটনাস্থল বাঙলাদেশের বাইরে বড়ো একটা নিয়ে যান নি, কবিতায় তো বাঙলার অজানা আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করেন নি। বুদ্ধদেবের ইংরেজি উক্তি এ বিষয়ে হচ্ছে :

Rabindranath, a tireless traveller in the body, was in spirit inalienably Bengali; his works, of the world in spirit, is in body entirely Bengali. (p. 61).

রবীন্দ্রনাথের পরে বুদ্ধদেব বলেছেন বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, সমর সেন, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি কবির কথা। তরুণতর কবিদের মধ্যে বলেছেন জীবনানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, অজিত দত্ত, অশোকবিজয় রাহা, জসীমউদ্দিনের কথা, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি বলেছেন,

It has been my endeavour to emphasize the individual nature of each rather than present our poets as belonging to a group or groups, or to the same age which, after all, is accidental.

(আমার চেষ্টা হয়েছে সব কবিকে একটি দলভুক্ত না করিয়ে প্রত্যেক কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে।)

১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি বিশ বছরের বাঙলা কবিতার সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিধৃত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'এক একর সবুজ ঘাস' পুস্তকে। শুধু কবিতাই নয়, বাঙলা গদ্যও, এবং জনকয়েক বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা : রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, শরৎ চট্টোপাধ্যায়। এই কালপরিবেশের মধ্য দিয়ে উঠলেন, জ্যোতিশ্চক্র সৃষ্টি করলেন আরো যেসসব বাঙালি লেখক, তাঁদের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব। স্বল্পায়ত বই, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে এ বই অমূল্য।

অমলেন্দু বসু

নির্মাণ আর সৃষ্টি—শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্রভবন। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। আটাশ টাকা।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর বইটির ভূমিকায় নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা একটি চিঠির উদ্ধৃতি-সহযোগে বহির্জগতের প্রতি মুহূর্তের নানা ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থেকেও রবীন্দ্রনাথের আপন অন্তরগহনের 'শিবম্ শান্তম্ অদ্বৈতম্'-বোধে সরে যাবার ক্ষমতা—এবং পরবর্তী কালে তাঁর সে-ক্ষমতা,—মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর নানা বিশ্বাস ইত্যাদি অটুট ছিল-কি-ছিল না, এই প্রশ্ন তুলে লেখেন—"স্থির কোনো কেন্দ্র আর রইল না কোথাও ?"—সঙ্গে-সঙ্গে আবার জানান—"মনে হয় না তা।" অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে তাঁর জীবনের শেষ পনেরো বছরেই—১৯২৭ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে পারিপার্শ্বিক স্বদেশ এবং ইউরোপ-আমেরিকার ঘটনাবলী আর সাহিত্য-শিল্পরুচির ঘূর্ণীর বিক্ষোভ পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারেন নি, এই কথাই লেখকের বিচার্য এবং বক্তব্য। তাঁর নিজের কথায়—"তাঁর জীবনের শেষ পনেরো বছরের ইতিহাস এরই এক টানা-পোড়েনের ইতিহাস। এরই ছোটো এক বিবরণ নিয়ে এই বই।" দ্বিতীয়ত, আধুনিকতা সম্বন্ধে চিন্তা আছে এই সূত্রে। "সমস্ত দেশের পক্ষেই"—তিনি এই—"অল্পবিস্তর সত্য" ব্যক্ত করেছেন যে, 'আধুনিকতা' আর 'আধুনিকবাদ'-এর ধারণা সমার্থক নয়। তৃতীয়ত, তিনি ঐ ভূমিকাতেই জানিয়েছেন, ১৯২০ সালে আমেদাবাদে 'কনস্ট্রাকশন ভারসাস ক্রিয়েশন' নামে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তাতে "আমাদের জীবনযাপনে, কীভাবে কোথায় সৃষ্টির চেয়ে নির্মাণের দিকে ঝোঁক হয় বেশি", সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গ অনুসারেই বইটির নাম দেওয়া হয়েছে। 'ভূমিকাতে'ই রবীন্দ্রনাথের ঐ চিন্তার তিনি যে সারসংক্ষেপ দিয়েছেন, সেই কথাগুলি তুলে দিলে আরো সোজাসুজি বোঝা যাবে বিষয়টি—"উপাদান আর তার প্রকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হয় যখন, তখনই আমরা পাই সৃষ্টিকে ; আর উপাদান যখন নিজেকেই প্রকাশ করে তার উগ্রতায়, তার বিচ্ছিন্নতায়, সে হলো আমাদের নির্মাণের জগৎ। এ নির্মাণের যে কোনো প্রয়োজন নেই তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়ো-কোনো সৃষ্টির অভিমুখী না হলে ব্যর্থ সে নির্মাণ, সেই হলো এক যান্ত্রিকতা।"

ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের নন্দনতত্ত্ব-সম্পর্কিত ধ্যানধারণার পর্যালোচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটি ১৯০৮ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে 'শারদোৎসব', 'গোরা', 'গীতাঞ্জলি', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে',—এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজের 'আত্মিকতার কেন্দ্র' ও 'বোধের পূর্ণতা' [এই ঊর্ধ্বকমা-চিহ্নিত প্রয়োগ দুটিই গ্রন্থলেখকের] ছুঁতে পেরেছেন বলে নির্মলকুমারীকে লেখা ঐ চিঠিতে তাঁর ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু ঐ চিঠিরই পরের অংশে দেখা যায় কবির এই মন্তব্য—"তার পরে নানা কঠিন চিন্তা, নানা জটিল কাজ, নানা চিত্তবিক্ষোভ আমাকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে—সে পথের নাগাল পাচ্ছিনে।"

'ভূমিকা'-তেই এই চিঠির তারিখ উল্লেখ করলে ভালো হত। লেখক তা করেন নি। তবে, একথা নির্মলকুমারী নিজেই অন্যত্র উল্লেখ করেছেন ['বাইশে শ্রাবণ' দ্রষ্টব্য] যে, ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূচনা—এবং ১৯৪১-এ তাঁর তিরোধান পর্যন্ত কবির নিবিড় স্নেহমমতার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে নকল করা আছে বোধহয়, এবং প্রকাশিত হয়ে গেছে। অতএব ঐ উক্তির তারিখের প্রসঙ্গ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে তেমন কোনো বাধা ঘটায় না। আসল জিজ্ঞাসা, শিল্প-রচনার ব্যাপারে 'নির্মাণ' আর 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে 'সাহিত্য' বইটির 'সাহিত্যের বিচারক' [আশ্বিন, ১৩১০], 'সাহিত্যের সামগ্রী' [কার্তিক, ১৩১০], 'সাহিত্যের তাৎপর্য' [অগ্রহায়ণ, ১৩১০], 'সৌন্দর্যবোধ' [পৌষ, ১৩১৩], 'বিশ্বসাহিত্য' [মাঘ, ১৩১৩], 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' [বৈশাখ, ১৩১৪], 'সাহিত্যসৃষ্টি' [আষাঢ়, ১৩১৪]—এসবেরও পূর্ববর্তী 'কাব্য' [চৈত্র, ১২৯৮] ইত্যাদি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সমীক্ষা ছিল,—যেমন শেষোক্তটিতে তিনি লেখেন—"কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ ; কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই, কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র",—নির্মাণ ও সৃষ্টি সম্পর্কে যে-কোনো আলোচনাই পরিণামে এইরকম সংবাদধর্মী হয়ে ওঠাই প্রত্যাশিত নয় কি ? শঙ্খ নিজে কবি। তাই তাঁর এই 'বিবরণ' [শব্দটি তাঁরই] গদ্যনিবন্ধ হলেও এতে তাঁর অনুভবের মাত্রা একটু যেন বেশি হয়ে গেছে।

'আধুনিক সাহিত্য' বইটির 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিহারীলাল', 'সঞ্জীবচন্দ্র' তিনটিই ১৩০১ সালের,— 'কৃষ্ণচরিত্র', 'রাজসিংহ', 'যুগান্তর', 'আর্যগাথা'ও ঐ সময়ের,—'আষাঢ়ে' ১৩০৫ সালের, 'মন্দ্র' ১৩০৯ সালের,—'জুবেয়ার' বৈশাখ, ১৩০৮ সালের। এই বইটিতে 'আধুনিকবাদ' সম্বন্ধে তেমন কিছু জানান নি তিনি, তবে শেষোক্ত নিবন্ধে রচনাবিদ্যা সম্বন্ধে জুবেয়ারের অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশটিও উল্লেখ করেন—"ভালো করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন।" ঐ প্রবন্ধেই তিনি 'স্টাইল'-এর সহজ প্রতিশব্দ 'ছাঁদ' যে 'রীতির' চেয়ে বেশি পছন্দ করেছিলেন তার নজীর আছে,—তবে শুধু ছাঁদ নয়,—'বলিবার ছাঁদ' 'লিখিবার ছাঁদ' এই বিশেষিত প্রয়োগই তাঁর নির্দেশিত। জুবেয়ারের কথা থেকেই 'লিখনরীতির চাতুরী' সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকা ও তা থেকে আত্মরক্ষার উপদেশ ছিল।

তাঁর 'সাহিত্যের পথের'-র 'তথ্য ও সত্য' (ভাদ্র, ১৩৩১), 'সৃষ্টি' (কার্তিক, ১৩৩১), 'সাহিত্যধর্ম' (শ্রাবণ, ১৩৩৪), 'সাহিত্যে নবত্ব' (১৯২৭), 'সাহিত্যবিচার' (কার্তিক, ১৩৩৬), 'আধুনিক কাব্য' (বৈশাখ, ১৩৩৯), 'সাহিত্যতত্ত্ব' (ভাদ্র, ১৩৪০), 'সাহিত্যের তাৎপর্য' (১৯৩৪) এবং অন্যান্য প্রবন্ধও সুপরিচিত। এই তালিকা অপ্রয়োজনতাড়িত নয় এখানে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের কথাপ্রসঙ্গেও এগুলি সবই দ্রষ্টব্য। শঙ্খ অনেক পড়েছেন, তাঁর রচনাচাতুরীও লক্ষণীয়, তাঁর নম্র শোভন স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বও সুবিদিত। এই শেষ তালিকার 'সাহিত্যবিচার' নিবন্ধের একটি উক্তি তিনিও অবশ্যই দেখেছেন। তবু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'সৃষ্টি'-প্রসঙ্গভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি পুনরায় মনে পড়ে—"সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি।... তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন।...সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না।...আজকাল সাইকো-অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে।" এই লেখাটিরই শেষ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন—"সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে [এই 'ব্যক্তিকে' মানে প্রকাশ-কে বা 'অভিব্যক্তি'-কে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়] নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"

অতঃপর এই তালিকারই 'আধুনিক কবিতা' নিবন্ধের এই মন্তব্যটি দেখে নেওয়া যাক—"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।"—এবং পরমুহূর্তেই তিনি লেখেন—"কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়।"

বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের কথাই বেশি এসে যাচ্ছে, তার কারণ শঙ্খ তাঁর কথা সত্যিই নতুন করে ভেবেছেন, ভাবিয়েছেন। ১৯৭৮-এ বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো হিসেবে রবীন্দ্রভবনের অজস্র সংগ্রহ ব্যবহার করে তিনি এই বইটি লিখেছেন। 'আমি' (পৃ ১৭-৬৭), 'ছবি' (পৃ ৬৮-৯৯), 'মুখোশ' (১০০-৩৫), 'চালচিত্র' (১৩৬-৭৪), 'প্রতিমা' (১৭৫-২১৬), 'দৃষ্টি' (২১৭-৫২) ও 'মুখশ্রী' (২৫৩-৩০৪)—এই সাতটি পর্বে তাঁর আলোচনা প্রবাহিত। পর্ব বা অধ্যায়গুলির নাম-প্রয়োগে তাঁর

অনুভবের ইশারা আছে এবং আলোচনার শুরুতেই ১ আষাঢ়, ১৩৪২ তারিখে চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে মুখটি সুন্দর ছাপা হয়েছে, তার ভঙ্গিতে নজর পড়লেই পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেই মুখ প্রসন্ন নয়, অন্ধকার। প্রথম অধ্যায় 'আমি'-তে শান্তিদেব আর ক্ষিতিমোহনের দুটি মন্তব্য উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে তাঁর যে যৌবনস্মৃতির প্রতি আতুর পিছু-ফিরে দেখার ভাবটির ইঙ্গিত পেয়েছেন শঙ্খ, সেই প্রসঙ্গ শুরু হয় এবং কথায়-কথায় ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ সালের চিঠির অংশ,—শিলারের চিন্তায় সব মানুষের মধ্যেই 'এক অ্যাকটিভ সোল'-এর ভাবনার সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম' বইটির 'বিশ্বভূমীনতা-ভাবনার সাদৃশ্য ;—থোরো-র 'ওয়ালডেন', রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র',—এমারসনের 'ওভারসোল'-ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত আমি'র উপলব্ধিগত সামীপ্য,—মানসী-চিত্রা-কল্পনা-তে ব্যক্তি এবং দেশের সামীপ্য বা সংশ্লেষ এবং গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-তে আত্মদর্শনের স্বাদ ইত্যাদি কত যে অনুষঙ্গ প্রবাহিত হয় নির্ঝরের বেগে! এ-বইয়ের সারসংক্ষেপ পরিবেশন করা কঠিন ব্যায়াম—এবং মনে হয়, তার চেয়ে পাঠককে এটি পড়ে দেখবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানোই এই রচনার প্রতি উপযুক্ত কৃত্য।

বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি স্বনামধন্য অনেকেই রবীন্দ্র-মনন ও রবীন্দ্রসৃষ্টির আধুনিকতা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এসব চিন্তা এই বইটিতেও নিহিত অল্পবিস্তর। তবে 'পথে ও পথের প্রান্তে' থেকে একাধিক উদ্ধৃতির দিকে অধ্যায়ের পরে অধ্যায়ের শিরোনামের নীচেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক এখানে রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি সিদ্ধান্ত ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন—যার পরিবেশনরীতি কবিজনোচিত অনুভবচিহ্নিত না হয়ে আরো দ্বিধাহীন, স্পষ্ট ও তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণধর্মী হলে সাধারণ পাঠকরাও উপকৃত হতেন।

'ছবি' অধ্যায়টি এইভাবে আরম্ভ হয়েছে—"কালো পাথরের বুক ভেঙে যেন নেমে আসছে আগুনের ঢল, নিজের মুখের এইরকম এক ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঠিক পঁচাত্তর বছর বয়সে।" সেই ছবির সঙ্গে তার দিন-দশেক আগে লেখা 'পত্রপুট'-এর 'বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে/ ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন' মেলাবার চেষ্টা দেখা দেওয়া একজন চিন্তাশীল গবেষক-কবির মনে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেখানেও তিনি লেখেন—"হয়তো-বা কোনো প্রচ্ছন্ন যোগ ছিল এই কবিতার সঙ্গে ওই ছবির" ইত্যাদি। পাঠকের তরফ থেকে বিনীত প্রশ্ন : বারবার এত 'হয়তো' কেন? রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্বে দুঃখের ভয়াল মূর্তি, বিকৃত ভাণ ইত্যাদি অনেক দেখতে হয়েছিল তো বটেই। কিন্তু একেবারে শেষ পর্বেও তো তিনি লিখে গেছেন—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'! এই 'মহামন্ত্র' মিথ্যে ছিল তাঁর ভেতরে ভেতরে, এই কথাটা যদি বলতেই হয় তাহলে সমুচিত জোর দিয়েই তা বলা দরকার। অনেক শিল্পীর বার্ধক্যের আত্মপ্রতিকৃতি, অনেকের 'জার্নাল'—ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি কারও কারও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের আলোচনায় অবচেতনের ইঙ্গিতে পৌঁছোনো ইত্যাদি বৃত্তান্ত জানাতে শঙ্খ দ্বিধা করেন নি,—'প্রান্তিক'-এর প্রতিমাগুলির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৭ সালের কঠিন অসুখের কথাও লিখেছেন—সেই বছরেরই 'সে' বইটির উদ্ভট মূর্তিগুলির প্রসঙ্গও এনেছেন। এ সবই যথাযোগ্য উত্থাপন। অজস্র এই বইটির লেখকের অধ্যয়ন। এবং তারই মধ্যে এই ধরনের কত ঈষৎ তির্যক উক্তি, যেমন 'চালচিত্র' অধ্যায়ে—"এই ব্যাপারটি যেন প্রায় প্রতীকী হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী [অর্থাৎ ১৯১৩-র পরে] বহু বিশ্বচারণায়, এই ব্যাপার যে, সামাজিক নানা স্তরের মানুষের মুখোমুখি হলেও নবীন পৃথিবীর কবিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো পথ তৈরি হবে না তাঁর।" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২১-এও নাকি সমকালীন জার্মান লেখকরা দেখা করতে আগ্রহী ছিলেন না [পৃ. ১৪০ দ্রষ্টব্য]! ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তা উপভোগ করেছেন,—নারীর ভালোবাসার মহিমায় অনুপ্রেরিত হয়েছেন,—কিন্তু তাঁর আগ্রহে নিবেদিত বোদলেয়রের একটি কবিতা শোনাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন রবীন্দ্রনাথ [পৃ. ১৪৩ দ্রষ্টব্য]।

এই তথ্যসমুদ্র পরিবেশন করার দক্ষতা মানতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে স্রষ্টা 'বিশ্বকবি'রূপেই প্রতিভাত, একথা মানেন লেখক। ১৯২৬-এর আগে পর্যন্ত গানের বাহনে এবং ১৯২৯ থেকে ছবির ভাবনায় বা ছবিরই বাহনে [পৃ. ২৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য] রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের গতিপথ বদলেছে। নির্মাণ আর সৃষ্টির প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে বইটির শেষ দিকেও [পৃ. ২৬১ দ্রষ্টব্য]। লেখকের কথায়—"রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা নিয়ে অনেক সময়ে যে সংশয় দেখা দেয় সাম্প্রতিক কোনো পাঠকের মনে, তার একটা কারণ আছে নির্মাণেরই...প্রকাশ্য আতিশয্যে।... এখানে তাঁর চেতনার সামনে প্রখর হয়ে জেগে থাকে আধুনিকবাদের নানা বহির্লক্ষণ, আর সেই লক্ষণকেই...তিনি মনে করেন মূল, মরণীয়কেই করে তোলেন স্মরণীয়।" এবং রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তিত হতে-হতেও আরো সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন [পৃ. ৩০৩], এই শেষ কথাটি জেনে উৎসুক পাঠক ভারি পরিতৃপ্ত হন। 'রোগশয্যায়'-এর ২৪ নম্বর কবিতার লাইন তুলে শঙ্খ জানিয়েছেন—মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ/মুখোষের নির্লজ্জ নকলে? "তা বিশ্বাস করেন না আমাদের এই কবি।"

হরপ্রসাদ মিত্র

অপরাজিতা-রচনাবলী—সম্পাদক নবনীতা দেব সেন। পরিবেশক : করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

অপরাজিতা দেবী যে রাধারানী দেব—এই পরিচয় লেখিকা নিজে স্বেচ্ছায় দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ চেপে রেখেছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বোধ করি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকে মনে রেখে। প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখার ফলে অপরাজিতা নিজেকে 'নাতনী'র সাজে সাজান, আর তাঁর চিঠির জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু দাদু হয়েই ওঠেন না, তাঁকে 'অপরাজিত' পরিচয়ে দাঁড়াতে হয়। 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা আধুনিকা' এবং চতুর্থ কবিতা 'গরঠিকানি' অপরাজিতার উদ্দেশেই রচিত। এই অপরাজিতা যে রাধারানীর প্রিয় বান্ধবী নন বরঞ্চ স্বয়ং রাধারানী সে-কথা কবি নিজে জেনে যান নি। জানবার প্রধান মুশকিল ঘটান রাধারানী 'পুরবাসিনী' কাব্যটিকে 'রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেব'কে উৎসর্গ করে।

আসলে কথাটা তুলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন রাধারানীকে যে মেয়েরা লিখলেও, ভালো লিখলেও, তাদের লেখায় নাকি ঠিক স্বকীয়তার ছাপ ফুটে ওঠে না। 'অর্থাৎ মেয়েদের নিজস্ব উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, মেয়েলি স্বর ও সুর তাদের রচনায় প্রকাশ হয় নি'। এই কথাবার্তার পর দর্পিতা রাধারানী 'লীলাকমলে'র বদলে 'বুকের বীণা'য় দিলেন টংকার। ধরলেন 'অপরাজিতা'র ছদ্মবেশ এবং 'চলচপলার চকিত চমকে' সেদিন পাঠক-পাঠিকাদের আনকোরা শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপহার দিলেন। রাধারানী আর অপরাজিতার মধ্যে আর কোনো মিল রইল না, নোতুন চালের কবিতায় অপরাজিতার জয়-জয়কার পড়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন 'মহুয়া' শেষ করেছেন, তাঁর যৌবনদূতেরা বলছে 'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।' ঠিক তার পরের বছর বার হল 'বুকের বীণা' (১৯৩০)। বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়লেন এবং চিঠিতে জানালেন তাঁর মতামত—

> এই রকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাএটি ভার্সেস্। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।...তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখীর গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে তাদের কথায় কাণ দিয়ো না! তাদের মন অশুচি। (২৯শে বৈশাখ ১৩৩৮)

বছর দেড় পরে আবার এই 'বুকের বীণা'কে উপলক্ষ করে অপরাজিতাকে লেখেন—

> তোমার লেখায় যে ভঙ্গী যে রঙ্গ কটাক্ষ হাসির যে কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা বাংলা সাহিত্যে আর কারো কলমে সেটা এমন করে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। দুষ্টু ঘোড়ার মতো ওর অবারিত চাল, অথচ খানাডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক এক লাফে। কারো বলবার জো নেই তোমার হাসি আর কারো হাসির মতো, তোমার গলার সুর আর কারো সুরে সাধা...(১৮ কার্তিক ১৩৩৯)

রবীন্দ্রনাথের এই স্নেহসিক্ত তারিফ মিলবার পর বার হল পর-পর 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫), 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭)। কিন্তু তার পরই অপরাজিতার প্রস্থান এবং অন্তর্ধান বাঙলার কাব্যমালঞ্চ থেকে। তাঁর প্রবেশ আর প্রস্থান দুটিই নাটকীয়। এই আকস্মিক প্রস্থানই কিন্তু অপরাজিতাকে সেদিনের তরুণ পাঠক—যাঁরা এখন বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা রেখেছেন, তাঁদের কাছে স্মরণীয়া করে রেখেছে।

বাঙলা কবিতায় একসময় বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস গার্হস্থ্যরস কিছু এনেছিলেন। দাম্পত্যজীবনের নানা টুকিটাকির মধ্যে 'রোমানসে'র আলো ফেলে তাকে রঙিন করে তুলেছিলেন, 'পারিজাত'-'অশোক'-'গোলাপগুচ্ছে'র কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন—

> ঘোমটা খুলিবে নাকো? থাকো
> তবে বসি
> আমি করি কাব্যপাঠ যামিনী
> জাগিয়া—

অথবা অকালপ্রয়াত 'নতুন খাতা'র কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের আবদারের কবিতা 'বেলফুল চাই না, যূঁইফুল দাও'—অনেকেরই মনে আছে।

অপরাজিতার প্রস্থান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) আগে। সে-যুগে যৌথ পরিবারপ্রথা, ভোগ্যপণ্যের দামে স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। কলেজের ছাত্রেরা অনেকে বিবাহিত, নববধূরা পঞ্চদশী থেকে অষ্টাদশী। শাশুড়ী, ননদ, জা, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে শ্বশুরালয়ে দিন কাটত। তখনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে আজকের মিল পাওয়া কঠিন। রাধারানী দেবী নিজে 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন—

> 'পৃথিবীর স্বাদ গন্ধ ঢের বদলে
> গেছে'।

এবং আজকার সর্বদিক দিয়ে রূপান্তরিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে এই কাব্যের ছবি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—তবু

দূরবনগন্ধবহ হাওয়ার মতো কবিতাগুলি এখনো মনকে খুশি করে তোলে।

আদর সোহাগ অভিমানে জড়ানো মধুর সুখের দিন-রাত যেমন এর চারদিকে ছড়ানো, তেমনি নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের একটি গৃহবধূর জীবনে বর্ষা যে কী দুঃসহ তার অত্যন্ত নিখুঁত বাস্তব ছবি পাই 'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি'তে—

শেওলা পিছল কলকাতা দিদি
ঘষে ঘষে মরি ঝামা!
...
ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরানো
ব'লে বোঝাবার নয়!
...
বিকচ কদম ঘন কেয়াবন কোনদিকে
জানিনি তা—
আজ আসি তবে, চিঠি দিও।
ইতি তোমারি অপরাজিতা।

বিস্ময় লাগে, যখন পড়ি 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭)। আমাদের ভারতীয় রসশাস্ত্রে নায়িকাপ্রকরণে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা প্রভৃতির যে রূপলক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে, তাকে সামনে রেখে আধুনিক কালের নায়িকার মধ্যে তাদের ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু অপরাজিতা সগৌরবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমি আশা রাখি সাম্প্রতিক কালের পাঠকবর্গ বইটি মুগ্ধচিত্তে পড়বেন এবং রাধারানী দেবী বলবেন—'কে তুমি পড়িছ বসি/আমার কবিতাখানি/কৌতূহলভরে'?

এই বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ 'সংযোজন' অংশটি। কেন অপরাজিতা লিখেছিলেন 'নারীপ্রগতি' আর তার জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকা' লিখে ; নাতনির পত্র আর দাদুর উত্তর উভয়ই কবিতায় ; অথবা রাধারানী ও অপরাজিতাকে লেখা কবির ছন্দোবন্ধ পত্র ; অপরাজিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই সংকলনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন সুমুদ্রিত, পরিচ্ছন্ন, সৌষ্ঠবময় গ্রন্থপ্রকাশ আজকাল বড়ো চোখে পড়ে না।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম—সমরেন রায়। পরিবেশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। তিরিশ টাকা।

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় আজ এক বিস্মৃতপ্রায় নাম"—গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখকের এই মন্তব্য বহুলাংশে যথাযথ। স্বাধীনতালাভের পর চার দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। নবীন প্রজন্মের তরুণসমাজকে অনতি-পশ্চাতের সামাজিক-রাজনীতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন বলে মনে হয় না।

বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদা লিখেছিলেন : "বৈপ্লবিক আন্দোলনে নরেন একজন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ব্যক্তি এবং নেতা ছিল। নরেনের সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল অদ্ভুত।"

এ মন্তব্য সেই সময়কার যখন তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বদেশের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যাপৃত।

এর পর মানবেন্দ্রনাথ রায় পরিচয়ে বাহির-বিশ্বে বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে যেসব কাজ করে গেছেন, তারই বিবরণ এই পুস্তকে সংগ্রথিত।

লেখক ১৯৩৯ সালে মানবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর অনুগামী হন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশদভাবে তথ্য আহরণ এবং বিশ্লেষণ, আর মতাদর্শের উন্মোচনের কাজে নিরত—এই প্রসঙ্গে ইংরেজিতে আর বাঙলায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন।

বইটি পরিশিষ্ট ছাড়া নয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। দুষ্প্রাপ্য অনেকগুলি চিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটির গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় কর্মী। পরবর্তী কালে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে নিজের চিন্তাভাবনাকে মুক্ত করে বিশ্বমানবের সার্বিক অভ্যুদয়ের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন, এবং লেনিনের সহযোগী হিসাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যুক্ত হয়ে শোষিত-নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতায় চিত্তের এই প্রসারণই তাঁকে মানবতাবাদী তত্ত্বভাবনার দিকে নিয়ে যায়। মানবেন্দ্রনাথের প্রতিপাদিত এই মানবতাবাদ গান্ধীবাদের সমার্থক বা সম্পূরক নয়—ধর্মগত বদ্ধসংস্কার এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। মানব-ইতিহাসের বিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর এই মানবতাবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত।

লেখক এই গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথের একটি তথ্যাশ্রিত জীবনী রচনার অনুষঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের গোড়ার দিকের নানা তথ্য এবং প্রামাণিক দলিল সংকলিত করেছেন। এটি বইটির এক বিশেষ আকর্ষণ।

ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই দেশত্যাগ করেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নানা পথ ঘুরে ১৯১৬ সালের ১৫ই জুন তিনি পেঁছন আমেরিকায়। সেখানে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ছিলেন 'চিত্রগ্রীব'-খ্যাত বিখ্যাত লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (ড. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাই)। তিনিই তাঁর আমেরিকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন ; এখানেই নরেন্দ্রনাথ মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন। এভেলিন টেন্টের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা এবং কর্মসাধনা নতুন এক ধারায় বইতে শুরু করে। রাজনৈতিক সহকর্মিণী এলেন সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে মানবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী এবং সমমর্মিণী। ন বছর ধরে চলে তাঁদের সংযুক্ত জীবনযাত্রা আর রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এর পরের পটভূমি মেকসিকো। এই অধ্যায়ের স্মৃতিকথা মানবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন—তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখনই তা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এইখানেই তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিখাইল বোরোদিনের সঙ্গে পরিচিত হন। বোরোদিনের সাহচর্যে এসেই তাঁর মার্কসীয় দর্শন আর রাজনীতির উপলব্ধি গভীরতা লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে যেদেশে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দেশটি মেকসিকো, আর মানবেন্দ্রনাথই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। সময়টা ১৯১৯ সাল।

১৯১৯ সালেই লেনিনের আহ্বানে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি মসকো রওনা হন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আছে নানামুখী বৈপ্লবিক কাজকর্মের তথ্যাশ্রিত বিবরণ, এবং তাঁর তত্ত্বভাবনার রূপান্তরের পর্বগুলিও লেখক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন।

আধুনিক ভারতে রাজনীতিক তত্ত্বচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বাদ দিয়ে আলোচিত হতে পারে না। ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, "মানবেন্দ্রনাথের জীবন যে-কোনো জীবনীকারের পক্ষে এক অপূর্ব উপাদান। এদেশের দুর্ভাগ্য যে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীর চেয়ে অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্য বুঝতে কিছু সময় লাগবে।"

আলোচিত বইটি দার্শনিক-রাজনীতিক মানবেন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য করবে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সমন্বয় : কিছু ভাবনা—রেজাউল করীম। বুকট্রাস্ট, কলকাতা-৯। চোদ্দ টাকা।

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রেজাউল করীম সাহেবকে সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি দেওয়া হয়েছে। এই সম্মানপ্রদান উপলক্ষে গত ১৪ই জুলাই বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ কনভোকেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। রেজাউল করীম এই কলেজেরই ইংরাজির শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন, এবং এই কর্মোপলক্ষে বহরমপুরে আসার পর থেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন। বিরাশি বছর বয়সের ভারে জীর্ণ কিন্তু মনের দিক থেকে অত্যন্ত সজীব রেজাউল করীম হিন্দু-মুসলমানর্নিবিশেষে বহরমপুরবাসীর কাছে মহান সন্তের সম্মান পেয়ে থাকেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রকাশ উপলক্ষে রেজাউল করীম লিখেছেন : "সারাজীবন সংস্কৃতি সমন্বয়ের জন্য প্রাণপণ সাধনা করেছি—এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি। সেই ভাবনার স্বাক্ষর প্রকাশ লাভ করায় এই রচনা-সংকলন আমাকে গভীর আনন্দ ও পরম সন্তোষ প্রদান করেছে।" গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর দিকে তাকালেই লেখকের অভিপ্রায় বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে না। প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে : 'ভারতে ধর্মসমন্বয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংস' 'ভারত-আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা', 'ভারতীয় মুসলমানদের উপর হিন্দু প্রভাব', 'কোরাণ চর্চায় বিনোবাজী', 'ফারসী চর্চায় হিন্দু সুধী', 'দীনে এলাহী', 'মরমী লেখক দারা শিকোহ', 'শহীদ সরমদ', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধিজীর দান', 'ইন্দো-ইরাণীয়ান সাহিত্যে জাতীয় অনুভূতি' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ'।

উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন : "রেজাউল করীম সাহেবের বই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সহায়ক হবে। তাঁর মতে সব ধর্মের একই লক্ষ্য। সত্যিকার ধার্মিক যাঁরা তাঁরা এটা স্বীকার করেন। ...প্রত্যেকটি ধর্মের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা নিজের মতো করে বুঝলে চলবে না। অন্যের মতো করে বুঝতে হবে। এর মতো কঠিন কাজ আর নেই। সর্বধর্মের একত্ব উপলব্ধি সর্বধর্মসমন্বয়। সব ধর্মের প্রতি সমান অনুরাগও সর্বধর্মসমন্বয় নয়। ওটা সমদর্শিতা বা সর্বমতসহিষ্ণুতা।" রেজাউল করীমের মতে, ধর্মসমন্বয় বলতে বোঝায় : "সব ধর্মই সত্য—সব ধর্মেই মুক্তি আছে। ধর্মমতে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক উদারতার সহিত সকল ধর্মকে দেখবে, কাহারও নিন্দা করবে না। এক উদার মনোভাবের দ্বারা এমন একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করবে যেন সকল ধর্ম স্বাধীনভাবে প্রতিপালিত হবে। একধর্মাবলম্বী লোক অন্যের সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সহিত মিলিত হবে, বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ভালবাসবে। এইভাবে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, যার ফলে প্রত্যেকে উপলব্ধি করবে, মানুষ বিভিন্ন পথে একই মহান বিধাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" (পৃ. ২) তাই তিনি

রামকৃষ্ণকে বলেছেন 'সমন্বয়ের অগ্রদূত', 'যিনি বর্তমান যুগে তাঁর আদর্শ স্থাপন করে দেখালেন যে একজন সত্যসন্ধ মানুষ একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান হতে পারে। চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সাধনা। এর অভাবে কিছুই হবে না। এইসব গুণ না থাকলে যে-ধর্ম পালন কর না কেন, তাতে সত্যোপলব্ধি হবে না।" (পৃ. ৫)

বিভিন্ন প্রবন্ধে রেজাউল করীম ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজজীবনে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়সাধনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি ধর্মসমন্বয়ের যে ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তার দ্বারা দেশের কোনো কোনো অংশের জনজীবন প্লাবিত হয়েছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামের আদর্শের সমন্বয়-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন : "সুফী সাধকদের আদর্শ হচ্ছে 'ফানাফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ'র মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করা। এই আদর্শটি বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' আদর্শের অনুরূপ। অজ্ঞাতসারে নির্বাণের আদর্শই সুফীদের মধ্যে প্রবেশ করে, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। শরীয়ৎ মেনে চলে এমন কোন মুসলমান বলবে না যে 'আমি খোদা'। অথচ আরবের বিখ্যাত সাধক মহর্ষি মনসুর ভাবের আবেগে হঠাৎ বলে উঠলেন 'আনালহাক' অর্থাৎ 'আমিই খোদা'। তাঁর সময়, বেদান্তের 'সোঽহং' আদর্শই সমধিকভাবে আরবে প্রচারিত হয়েছিল, নতুবা কোন মুসলমানই 'আমিই খোদা' একথা বলতে সাহসী হত না। আর ঐ কথা মনসুর বলেছিলেন বলে তাঁকে কাজীর আদেশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সুফীগণ 'জিকর' করেন, তাও ভারতের যোগপ্রথা থেকে গৃহীত। (পৃ.১৪) প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন মুসলিম পণ্ডিত হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রতিমাব্যবহারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন তা এখানে উল্লেখ্য। মির্জা মাজহার জান জানান বলেন যে, "প্রতিমাপূজা সুফীদের জিকিরপদ্ধতির অনুরূপ। আরবের পৌত্তলিকগণ যে প্রতিমা পূজা করিত, হিন্দুদের প্রতিমা তাহা নহে। তাহারা প্রতিমাকে ঐশ্বরিক শক্তির যন্ত্র বলিয়া মনে করে।" মির্জা মাজহার এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুদের পন্থায় আছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তাঁর মতে সুফী মতবাদেও এই তিনের সমন্বয় সাধিত হয়। (পৃ. ২৫) রেজাউল করীমের মতে, এই ধরনের সমন্বয় অজ্ঞাতসারে হয়নি। দেশ ও কালের অনুরূপ করবার জন্য জ্ঞাতসারেই বেদান্তদর্শনের বহু আদর্শ মুসলিম সমাজের মধ্যে সুফীগণ প্রবর্তন করেছিলেন।

ধর্মসমন্বয়ের প্রশ্নে সম্রাট আকবরের 'দীনে এলাহি' নিঃসন্দেহে একটি সজ্ঞান প্রচেষ্টা। এইরূপ আর-একটি সচেতন প্রয়াসের প্রকৃষ্ট নজির হল রাজকুমার দারাশিকোহ্ কর্তৃক হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় ধ্যানধারণার সমন্বয়সাধনা। যে যুগে মুসলমানগণ সাধারণত হিন্দুধর্ম বা অপরাপর ধর্মকে উদারভাবে আলোচনা করতে চাইত না, সেই যুগে দারাশিকোহ্ এমন সহজ-সরল ও উদার ভাবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করে গেছেন যে দেখলে মনে হয় যেন বিংশ শতাব্দীর কোন যুক্তিবাদী লেখক বিভিন্ন ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টায় লেখনী ধারণ করেছেন। (পৃ. ৫৬) প্রসঙ্গক্রমে আর-একজন সুফী সাধকের কথা রেজাউল করীম উল্লেখ করেছেন। দারাশিকোহ্'র মতো তিনিও ঔরঙ্গজেবের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তাঁর নাম সরমদ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর রুবাইয়াত প্রকাশ করা হয়েছে। সরমদের মতে, সুফীদের পন্থাই সত্য পন্থা। এই পন্থাই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তাই তিনি শরীয়তের পন্থা মেনে চলতেন না। তিনি বলতেন শরীয়ত একটা লোক-দেখানো প্রদর্শনী মাত্র। তাঁর মতে শরীয়তপন্থীরা প্রেমের পথ জানে না। অথচ প্রেমের পথই ঈশ্বরের পথ। (পৃ. ৭৪)

এইভাবে একের পর এক মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্মসমন্বয়ী সাধকদের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে রেজাউল করীম দেখিয়েছেন, মধ্যযুগে বহিরাগত মুসলমানেরাও ভারতবর্ষকেই মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য সবই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হয়েছিল তা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। ফলে সমস্ত জীবনদর্শনের মধ্যে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা একই রূপ হয়েছে। (পৃ. ২৯) লেখকের ধারণা, যদি ইউরোপীয় শক্তি ভারতপ্রবেশের কোনো পথ ও সুযোগ না পেত তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"বৃটিশ যুগের পর ফারসীর স্থলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হল ইংরেজি। সুতরাং দেশে ইংরেজি শিক্ষার খুব ধুম পড়ে গেল ; আর ফারসী ভাষা অবহেলিত হতে লাগল। তারপর থেকে ফারসী বিষয়ক আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে হিন্দু চিন্তা ও মুসলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে আদানপ্রদান হয়ে আসছিল। ফলে উভয় ধরনের চিন্তাধারা একই মহাসাগরে মিলিত হচ্ছিল। এইভাবে ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পথ সুগম হয়ে আসছিল ; কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সে সমন্বয় বন্ধ হয়ে গেল।" (পৃ. ৪৬)

বিনোবাজী কোরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েকটি আয়াত সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার নাম 'রুহুল কোরআন' বা কোরানসার। এই নিয়ে সেই সময় মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে লেখা হয়, 'গ্রন্থটিতে ইচ্ছেমতন গ্রহণ, বর্জন ও সংশোধন করা হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে রেজাউল করীম এই ধারণা যে নিতান্তই অযৌক্তিক এবং অসৎ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তা ব্যাখ্যা করে দেখাতে গিয়ে বলেছেন : "কোন ধর্ম কাহারও ব্যক্তিগত এক-চেটিয়া সম্পত্তি নহে। ঈশ্বরের বাণী সকলের জন্য। প্রত্যেক মানুষ তাহা হইতে প্রেরণা পাইতে পারে। প্রত্যেকের তাহা পড়িবার ও ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আছে। বিনোবাজী ত সকল ধর্মকে ভালবাসেন। তাঁহার কণ্ঠে যদি ইসলামের কথা শুনি তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? বরং এই কথা বলিব যে বিনোবাজীর কণ্ঠে ইসলামের বাণী যখন শুনি তখন নূতন করিয়া ইসলামকে বুঝিবার চেষ্টা করি। আমিও মনে করি কোরআনের সারগ্রন্থ রচনা করার জন্য সমস্ত মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে বিনোবাজীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।' (পৃ. ৩৭)

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধিজীর দান বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে রেজাউল করীম বলেছেন, আত্মদানের আগে পর্যন্ত মুসলমানেরা সঠিকভাবে বোঝে নি যে গান্ধিজী তাদের প্রকৃত বন্ধু।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজ কিভাবে ঋণী তা ব্যাখ্যা করে দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খুব বড় করে দেখিয়েছেন। এতে মুসলমানদের বিরূপ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের বুঝতে হবে সংস্কৃতি যত প্রাচীন কালেরই হোক, ভারতের বুকে যার উদ্ভব ঘটেছে তা মুসলমানেরও সম্পত্তি। কারণ ভারতবাসী তারাও। ঠিক এই ভাবটি কামাল আতাতুর্ক ও রেজাশাহ পহলবী বুঝতে পেরেছিলেন বলেই প্রাক্-ইসলাম যুগের সংস্কৃতি তাঁদের কাছে আদরণীয় হয়েছে। সে যুগের সভ্যতাকে তাঁরা নিজস্ব বলে দাবি করে গর্ববোধ করেছেন। ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব ঠিক এমনটাই হওয়া উচিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি আজ কেবলমাত্র হিন্দুর সম্পত্তি হতে পারে না। লেখকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুপ্রীতির গোড়ার কথা গভীর স্বদেশপ্রীতি। তিনি বুঝেছিলেন পরাধীন জাতি স্বদেশপ্রীতি ব্যতীত উন্নত হতে পারবে না। এই কথাটাই তিনি নানাভাবে উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও রঙ্গরসের মধ্যে বুঝিয়ে গেছেন। হিন্দু নয় মুসলমান নয় এরূপ যেকোন পাঠক বঙ্কিমের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাবল্য দেখতে পাবে। তার কাছে মুসলিম বিদ্বেষটা ফুটে উঠবে না। ফুটে উঠবে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির কথা। (পৃ. ১০০)

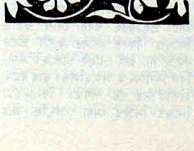

রেজাউল করীমের এই অভিমতের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক আবুল হাসানত লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রেজাউল করীমের বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রীতি-জাত একপ্রকার অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধার ভাব ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের (উনবিংশ শতকের আরও অনেক চিন্তাবিদের মতো) অতীতচারিতার মধ্যে যে হিন্দু উজ্জীবনের সূত্রসন্ধান ছিল তাকে তিনি প্রায় উপেক্ষা করেছেন বলা যায়।" (সম্পাদকের কথা, পৃ. ম.) 'বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ' লিখিত হয় ১৯৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে। সেই সময় দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা ক্রমশই প্রাবল্য লাভ করতে থাকায় যে সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা রেজাউল করীমের এই অভিমতকে হিন্দু-মুসলিম কোন সমাজেই যথার্থ অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। তথাপি তিনি যে এমন একটা প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন, এ শুধু তাঁর চিত্তের উদারতা নয়, নিজের প্রত্যয়ের প্রতি নির্ভীক আনুগত্যেরও নিদর্শন।

আবদুর রউফ

দেশে বিদেশে

ভুল রাস্তা

প্রতি বছরের মতো এবারও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কে প্রথম হল, কে দ্বিতীয়, কোন ইস্কুল থেকে কে সপ্তদশ হল, কে উনবিংশ—এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর গণসংবর্ধনা ইত্যাদির পালা। ভবিষ্যৎ জীবনে এদের মধ্যে কে দেশের মুখ কতটা উজ্জ্বল করবে, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর বলেই মনে হয়। আপাতত, পরীক্ষায় নম্বরের দৌড়ে যারা বাজিমাত করেছে, বাহবা তাদের অবশ্যই প্রাপ্য।

কিন্তু আর-যেসব ছেলেমেয়ে হাজারে হাজারে উচ্চতর শিক্ষার দরজায় দরজায় ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর মুখ কালো করে শুনছে বিজ্ঞানের ক্লাসে তাদের জন্যে ঠাঁই নেই, এবং সেই কারণেই মনে করছে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাদের জীবনটাই বৃথা—সেই ছেলেমেয়েদের কথা কে ভাবছে? আর, পরীক্ষায় যারা আদৌ পাসই করতে পারে নি, তাদের মুখের দিকে কেউ তাকাবে—এমন আশা করাই তো বাতুলতা।

বাছাই-করা ইস্কুল-কলেজের বাছাই-করা ছেলেমেয়েদের কথা ছেড়ে দিলে, বিপুলসংখ্যক সাধারণ ছাত্রছাত্রী এখন এমন এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছে যে তাদের প্রথম কৈশোরের নবীন আশার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। এমন অন্ধ, অবিবেচক, হৃদয়হীন শিক্ষাব্যবস্থার কবলে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা ঠেলে দিয়েছি যে ভাবলে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

আমরা বীজমন্ত্রের মতো তাদের কানে দিবারাত্র জপ করছি—"ইনজিনীয়র হও, ডাক্তার হও, যদি মানুষের মতো মানুষ হতে চাও।" তারপর, গুটিকয়েককে বিজ্ঞানের ক্লাসে ঢুকিয়ে দিয়ে, বাকি সকলের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলছি—"পথ দেখো।"

সবাই জানে, লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো করতে না পারলে ডাক্তার-ইনজিনীয়র হওয়া যায় না। কিন্তু ওই দুটি বৃত্তি ছাড়া মেধাবী ছাত্রের সামনে আর-কোনো ভবিষ্যৎ খোলা নেই—এই ধারণা যেমন ভুল, ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষায় উজ্জ্বল কৃতিত্ব দেখাতে না পারলে তাতেই একজনের অপদার্থতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল—এই অন্ধবিশ্বাসও তেমনি ভ্রান্ত। শুধু ভ্রান্তই নয়—সর্বনাশকরও: ব্যক্তির পক্ষেও বটে, সমাজের পক্ষেও বটে। জীবনে চরিতার্থতা-লাভের পথ চতুর্দিকে প্রসারিত। যে সমাজ প্রত্যেককে তার নিজস্ব ক্ষমতা, চরিত্র এবং প্রবণতা অনুযায়ী আত্মবিশ্বাস তথা আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়, যে সমাজ বিচিত্র ধরনের কৃতিত্বকে যথোচিত সমাদর, মর্যাদা এবং মূল্য দেয়, সেই সমাজই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নানা দিক থেকে।

এক মারকিন শিক্ষাবিদ বলেছিলেন, যে সমাজ ভালো-মন্দ-নির্বিশেষে দার্শনিকমাত্রকেই স্বর্গে তোলে আর কলের মিস্ত্রিদের হেয় জ্ঞান করে, দেখা যায়, সেই সমাজে ধ্যানধারণা যেমন অচল, জলের কলও তেমনি অকেজো (নায়দার ইটস পাইপস নর ইটস থিয়োরিজ উইল হোলড ওয়াটার)।

আমরা অবশ্য দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিরই কদর বেশি করতে শিখেছি, কিন্তু জলের ফুটো তাতে কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে। মানবিক বিদ্যাসমূহ অবহেলিত। তার মানে, বিদ্যার্জনের যে পর্যায়ে বিদ্যার্থীরা নিজের নিজের মেধা, প্রবৃত্তি আর ক্ষমতা অনুযায়ী নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থায় সেই পর্যায়ে পৌঁছে সবাই মরিয়া হয়ে দৌড় শুরু করতে চায় সেই বাঁধা সড়কটা ধরে—যে সড়কের শেষে ইনজিনীয়ারিঙ বা ডাক্তারি ডিগ্রির হাতছানি।

এই পাগলামির ভূত যত দিন না আমাদের কিশোর-যুবসম্প্রদায়ের ঘাড় থেকে নামে, তত দিন ব্যাপক হতাশা আর উদ্যমহীনতার হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই।

শাখারভ

গত ৩রা অগস্ট মসকো থেকে পাঠানো এই খবরটি পরদিন কলকাতার সংবাদপত্রে বেরোয়: মসকোয় এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগদানকারী একজন মারকিন বিজ্ঞানী বলেছেন, বিক্ষুব্ধ পদার্থবিদ আনদ্রেই শাখারভ বেঁচে আছেন বলে রুশ বিজ্ঞানীরা ওই বৈঠকে বিজ্ঞানীদের জানিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, শাখারভ বর্তমানে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। রুশ বিজ্ঞানীরা শাখারভের বিষয়ে আর কিছু বলতে রাজি হন নি।

সেই তিন জাপানি বাঁদর, 'সামবিকিমারু'র কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে: মিজারু মন্দ কিছু দেখে না, কিকাজারু মন্দ কিছু শোনে না, ইওয়াজারু মন্দ কিছু বলে না। মসকোর চোখে শাখারভ এখন নিতান্ত মন্দ। শাখারভ যেদিন গ্রেপ্তার হন, সোভিয়েত সরকারের মুখপত্র তার পরদিনই তাঁকে এমন সব অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে যাতে মৃত্যুদণ্ডও তেমন লোকের পক্ষে খুব লঘু শাস্তি মনে হতে পারে। 'ইজভেসতিয়া' লিখেছিল "শাখারভ আমাদের মাতৃভূমির এবং সোভিয়েত জনসাধারণের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে বিকিয়ে দিতে চলেছেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শত্রুতা করবেন বলে শপথ নিয়েছেন এবং জঙ্গী কমিউনিস্ট-বিরোধীদের দলে গিয়ে ভিড়েছেন।" তা ছাড়া, ইজভেসতিয়ার আদালতে আরও প্রমাণিত হয়েছে, শাখারভ খবরের কাগজের লোকেদের কাছে পুনঃপুন এমন সব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে রাষ্ট্র যেগুলিকে সযত্নে গোপন করে রাখে।

এমন অবস্থায়, শাখারভের কথা কানে না শোনা, তাঁর কথা মুখে না বলা রুশ-দেশবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আর, চোখে যাতে দেখতে না হয় সেজন্যে নির্বাসনে তাঁকে আগেই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সার্বভৌম সর্বহারার শাসনের বাইরে যে বিশাল বিশ্ব, শাখারভ কি তারও চেতনার প্রত্যন্তে নির্বাসিত? ক্বচিৎ কদাচিৎ মৃদু-গুঞ্জনে তাঁর নাম হয়তো শোনা গেল, আবার সঙ্গে-সঙ্গে চাপা পড়ে যায় সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কেন? শাখারভ কি আমাদের সকলের আলমারিতে-লুকিয়ে-রাখা নরকঙ্কাল?

কে এই অবাঞ্ছিত রুশ? যতই আমরা না-জানার ভান করি, শাখারভের কাহিনী মোটামুটিভাবে আমরা অনেকেই জানি। তবু, সংক্ষেপে তাঁর খ্যাতি আর অখ্যাতির ইতিহাস একটু স্মরণ করি।

আনদ্রেই দিমিত্রিয়েভিচ শাখারভের জন্ম ১৯২১-এ। মসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি ভরতি হবার জন্যে হাজির হন, তার আগেই পদার্থবিদ্যার উজ্জ্বলতম ছাত্র হিসেবে তিনি নাম করেছেন। যুদ্ধের পর মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ মর্যাদার অধ্যাপক-পদ পান। একের পর এক তাঁর গবেষণাপত্র বেরোতে থাকে। তারপর হঠাৎ, ১৯৪৮ সালে তাঁর নাম একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

তার কারণ, তাঁকে হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কাজে লাগানো হল। গভীরতম গোপনীয়তার মধ্যে কাজ করে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী বিজ্ঞানীদের একটি দল পারমাণবিক অস্ত্রে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটে অধিকার ভেঙে দিলেন। তাঁর এই কীর্তির এবং আনুষঙ্গিক আরও অন্যান্য কৃতিত্বের জন্যে গোপনে তাঁকে তিনটি সম্মানে ভূষিত করা হল: অর্ডার অব সোশ্যালিস্ট লেবার (সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান), স্তালিন পুরস্কার এবং লেনিন পুরস্কার। তা ছাড়া তিনি পেলেন অসাধারণ উচ্চ বেতন, অসাধারণ ভালো বাসস্থান, ড্রাইভারসমেত গাড়ি, সাধারণের অলভ্য নানাবিধ ভোগ্যবস্তু এবং সর্বক্ষণের দেহরক্ষী। ১৯৫৩ সালে, বত্রিশ বছর বয়সে শাখারভ সোভিয়েত অকাদেমি অব সায়েনসেস-এর পূর্ণ মর্যাদার সদস্যপদ পেলেন। এত অল্প বয়সে এত বড়ো সম্মান আর কোনো রুশ বিজ্ঞানী অর্জন করেন নি।

আর কী চাই? বাকি জীবনটা তিনি মেধার বিনিময়ে মেদ সঞ্চয় করে পরম আরামে কাটিয়ে দিতে পারতেন। অকাদেমি অব সায়েনসেস-এর অন্য সদস্যদের দৃষ্টান্ত সামনেই ছিল। কিন্তু বিবেকের পোকা যাকে কামড়াতে আরম্ভ করে, কৃষ্ণসাগরের তীরে ডাচা তাকে সারাক্ষণ কাঁটার মতো বেঁধে।

রুশ হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুতে নিজের ভূমিকার কথা ভুলতে পারলেন না বলেই সম্ভবত শাখারভ মনে করলেন—সেই বোমার বিপদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার দায়টাও তাঁর নিজেরই। একই রকম দায়িত্ববোধের তাড়নায় ডাইনামাইটের আবিষ্কারক নোবেল শান্তিপুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। আরেকজন পদার্থবিজ্ঞানীর কথা আমরা জানি—আইনস্টাইন। তিনিও ভুলতে পারেন নি আণবিক বোমা আবিষ্কারে তাঁর নিজের হাত ছিল এবং সেইজন্যে বাকি জীবনটা যুদ্ধের বিরোধিতা করে কাটালেন। শাখারভ ১৯৫৮ সালে বায়ুমণ্ডলে রুশ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন তিনি। ১৯৬১-তে এবং তারপরে আবার ১৯৬২-তে তিনি সোজাসুজি ক্রুশ্চভকে অনুরোধ করলেন—ব্যাপক হারে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করুন। অরণ্যে রোদন। কয়েক বছর পরে মসকোতে নিউ ইয়রক টাইমস-এর সংবাদদাতাকে তিনি বলেছিলেন, "তখন আমার নিদারুণ অসহায় মনে হল নিজেকে। কিছুই করতে পারছি না। তারপর যেন আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আমার পারিপার্শ্বিক থেকে আমি আলাদা হয়ে গেলাম।...গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসানো আমার শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে আমার জীবনে যা-কিছু এসেছে সবই স্বাভাবিকভাবে এসেছে।"

মসকোতে একটা আলাদা জগৎ ছিল সেইসব বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা শাখারভের মতোই গড্ডালিকা-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁর মতোই অস্থির, অসন্তুষ্ট, বিবেক-দংশনে পীড়িত। তাঁদের সকলের ভয় স্তালিনের যুগ পাছে আবার ফিরে আসে। তেমনি একজন মানুষ রয় মেদভেদেভ। তিনিও সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠীর কুনজরে পড়েছেন। অবশ্য গ্রেপ্তার হন নি। যদিও নানারকমে উৎপীড়িত হয়েছেন, কর্মচ্যুত হয়েছেন। তাঁর যমজ ভাই, বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী জোরস মেদভেদেভ কিন্তু অত সহজে রেহাই পান নি। ১৯৭০ সালের মে মাসে তাঁকে জোর করে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মনোরোগী বলে আটকে রাখা হয়। তাঁর অপরাধ, তিনি লাইসেঙ্কোর উত্থান এবং পতনের ইতিহাস রচনা করেছিলেন, এবং তাতে দেখিয়েছিলেন রাজনীতির কবলে পড়ে বিজ্ঞানের কী দুর্দশা হয়। লাইসেঙ্কো-ঘটিত কেলেঙ্কারি এবং সোভিয়েত বিজ্ঞানের আরো নানা গোপন ব্যাধি সর্বসমক্ষে প্রকট করার অপরাধে জোরস মেদভেদভকে পাগল প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোভিয়েত সরকার আর-এক নতুন কেলেঙ্কারি বাধালেন। মসকোতে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানীরা

প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব জেনেটিকস-এ বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শাখারভ বিজ্ঞানীদের অনুরোধ জানালেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে। কর্তৃপক্ষ বেগতিক দেখে উনিশ দিন আটক রাখার পর জোরসহ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে তিনি যাতে ফিরে যেতে না পারেন সে বিষয়ে তাঁদের চেষ্টার কোনো শিথিলতা দেখা গেল না। ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে জোরস ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চ-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এখন তিনি সেখানেই আছেন।

এদিকে রয় মেদভেদেভ মস্কোর বুকে বসে মস্কোর দাড়ি ওপড়াবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি স্তালিনবাদ, কিংবা বলা যায় স্তালিনতন্ত্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করে একখানি প্রকাণ্ড বই লিখলেন 'ইতিহাস বিচার করুক'। এই বইটির প্রথম পাঠকদের মধ্যে একজন শাখারভ। রয় মেদভেদেভের সঙ্গে পরিচয় নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। একথা শাখারভ নিজেও স্বীকার করেছেন। যদিও পরবর্তী কালে কোনো কোনো বিষয়ে দুজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়।

১৯৬৮-র গোড়ার দিকে শাখারভ 'প্রগতি, সহাবস্থান এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা' নামে একটি নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী তখন রাশিয়ায় এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশে দেশে নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছে। শাখারভের লেখায় অনেকে মুক্তির স্বাদ পেলেন। সলঝেনিতসিন তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন : "আমাদের হৃদস্পন্দন দ্রুত হল যখন দেখলাম শেষ পর্যন্ত একজন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন। যে নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত সুখনিদ্রায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আচ্ছন্ন, নিজেদের নির্দিষ্ট কাজটুকুই শুধু করে যান, টেস্ট টিউবের মধ্যেই তাঁদের চিন্তাভাবনাকে আবদ্ধ রাখেন এবং পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর টাকা পান, প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন, দেখলাম একজন সেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন।"

১৯৬৮-র অগস্টে ওয়ারশ-চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির সৈন্যবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করল। তখনই বোঝা গেল, শাখারভের চিন্তাভাবনার কোনো কদর পূর্ব-ইউরোপ করবে না। একদিন সকালে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে দেখলেন—তাঁর ঢোকবার পথ বন্ধ। পরে জানানো হল তাঁর চাকরি নেই। একটি বছর তিনি বেকার। পরে সিনিয়র রিসারচারের কাজ পেলেন।

তারপর থেকে সমানে চলেছে শাখারভের সংগ্রাম। সোভিয়েত সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সংরক্ষণে তাঁর এত শক্তি, এত সাহস, এমন দুর্জয় সংকল্প কোথা থেকে এল! ভাবলে অবাক লাগে। কোথায় কোন মানবিক অধিকারের সৈনিক কারারুদ্ধ হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, মানসিক হাসপাতালে বন্দী হয়ে আছেন—শাখারভ এগিয়ে এসেছেন তাঁর জন্যে সুবিচার আদায় করতে। হেলসিংকি চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার রুশ নাগরিকরা ভোগ করছেন কিনা, তার ওপর নজর রাখবার জন্য হেলসিংকি গোষ্ঠী তৈরি হল, তাকে সহায়তা দেবার জন্যে শাখারভ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। এহেন মানুষকে সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সমাজদর্শন বেশি দিন বরদাস্ত করতে পারে না। যদি পারত, এহেন মানুষের প্রয়োজন হত না।

১৯৭০-র ২২ জানুয়ারি শাখারভ আটক হলেন। সরকার তাঁকে অপহরণ করলেন বললেই ঠিক হয়। আকাদেমি অব সায়েনসেস-এর ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামনে তাঁর গাড়ি থামিয়ে পুলিস তাঁকে অন্য একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা প্রসিকিউটারের দপ্তরে হাজির করল। সেখানে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রিসিডিয়ামের একটি আদেশ তাঁকে পড়ে শোনানো হল : যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মান তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও শুনলেন, মস্কো থেকে ২৫০ মাইল দূরে গর্কিতে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। স্ত্রী এলেনা তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। হাতে দু ঘণ্টা সময়, তারপরই রওনা হতে হবে।

বেশ কিছু দিন শাখারভকে গ্রেপ্তার করার জন্যে, কিংবা অন্তত খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে যাতে তিনি যোগাযোগ করতে না পারেন, সেরকম কোনো ব্যবস্থা করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের হাত নিশপিশ করছিল। আফগানিস্তান অভিযান সেই সুযোগ এনে দিল। অভিযান শুরু হবার সাত দিনের মধ্যে শাখারভ রাষ্ট্রসংঘের দরবারে এক আবেদন পাঠালেন—সোভিয়েত ইউনিয়নকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলুন। এদিকে মস্কোয় তখন আফগানদের শায়েস্তা করতে গিয়ে বিশ্বজনমতের দরবারে নাজেহাল ; রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নিন্দিত, ইসলাম-জগতে ক্রমবর্ধমান কটু সমালোচনার সম্মুখীন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সেখান থেকে আর নীচে নামবার অবকাশ নেই বললেই চলে। কাজেই, মস্কোকে সম্ভবত ভাবল—শাখারভকে গ্রেপ্তার করলেই বা এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে?

লক্ষ করবার বিষয়, যেদিন থেকে শাখারভ মানবাধিকারের লড়াইকে নিজের লড়াই বলে গ্রহণ করেছেন, সেই দিন থেকে প্রায় বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে। দেশের মধ্যে বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হন নি—যখনই দরকার মনে করেছেন বাইরের জগৎ থেকে সমর্থন চেয়েছেন, সাহায্য চেয়েছেন। 'ইজভেসতিয়া'-র মতে, এর নাম দেশদ্রোহিতা, মাতৃভূমির প্রতি শত্রুতাচরণ। রাশিয়াতে এই মত সবাই সমর্থন করেন কিনা, এই মনোভাব সর্বজনীন কিনা—যাচাই করার কোনো পথ নেই। কিন্তু আমেরিকাতে ভিয়েতনাম-যুদ্ধে নিজের সরকারের যাঁরা বিরুদ্ধতা করেছিলেন তাঁদের দেশদ্রোহী বদনাম দিলে তার কী প্রতিক্রিয়া এখন হবে, আমরা আঁচ করতে পারি।

শাখারভের নির্বাসনদণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রতিবাদের ধ্বনি উঠল। ইউরোপ এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জানালেন প্রবল ক্ষোভ। ফরাসি পারলামেনট ন্যাশনাল অ্যাসেমবলির অধ্যক্ষ দশ দিনের সফরে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। সফর অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে এসে তিনি বললেন, "সোভিয়েত দেশের অতিথি হিসাবে আমি তাঁদের আভ্যন্তরিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারি না, আবার চুপ করে থাকাও অসম্ভব। তাই যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে আসতে আমি বাধ্য।" উনিশ জন সোভিয়েত লেখক আর শিল্পী (তাঁদের সকলেই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত নন) এক বিবৃতি প্রচার করলেন : "আন্দ্রে দিমিত্রিয়েভিচ শাখারভকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা এক জঘন্য মিথ্যা। শাখারভের নাম বিশ্ববিখ্যাত, চিত্তের মহনীয়তা এবং মানবিক ধর্মের সমার্থক।"

তার পর থেকে শাখারভ গর্কিতে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার নেওয়ার জন্যে অসলোতে যাবার অনুমতি তিনি পান নি। ইতিমধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর আসতে শুরু করে। তাঁর স্ত্রীও অসুস্থ। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দেওয়া হোক—এই দাবিতে গত মে মাসে তিনি অনশন আরম্ভ করেন।

স্বভাবতই, এ খবরে উদ্বেগ বেড়ে ওঠে। ২০ মে অবশ্য ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এক বেতার-সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাঁর কাছে উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষমহল থেকে খবর এসেছে—শাখারভ ভালো আছেন।

বলা বাহুল্য, এতে উদ্বেগের নিরসন হয় নি। ১৮ মে মারকিন সেনেট ৭৬-০ ভোটে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট রেগানকে অনুরোধ করেন—তিনি যেন শাখারভ দম্পতির বন্দীদশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, এবং সোভিয়েত সরকারের ওপর চাপ দেন, যাতে তাঁরা শাখারভকে সস্ত্রীক দেশত্যাগ করে বিদেশে বসবাস করতে দেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ছটি বিশ্ববিদ্যালয় একই আবেদন করেছেন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে। ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপকপদে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইতিপূর্বে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ আমন্ত্রণ জানায়।

এই অবস্থাই চলছে। অতি সম্প্রতি আবার খবর এসেছে—শাখারভ অনশন থেকে নিরস্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে জোর করে হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে।

শাখারভ এখনও বিনা বিচারে বন্দী।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত

বাঙলার রাগসংগীত

ভারতীয় সংগীতের দুটি ধারা—একটি রাগসংগীত, অপরটি কাব্যসংগীত। রাগসংগীত কালে-কালে পরিবর্তন স্বীকার করে আজও নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, কিন্তু কাব্যসংগীতের বেলায় সেটা ঘটে নি—কাব্যসংগীত প্রবহমান যুগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে এই হয়েছে যে, এক যুগের সুগঠিত জনপ্রিয় সংগীত সেই যুগের চাহিদা ফুরোতেই বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেছে ; আবার গড়ে উঠেছে নতুন চাহিদা অনুসারে নতুন ধরনের গীতিকলা। কিন্তু ঐতিহ্য এত সহজেই বিলুপ্ত হয় না। বিস্মৃতি ঘটলেও জনমানসের অগোচরে একটা ধারার রেশ থেকে যায় এবং সেটা অনুপ্রবেশ করে নতুন সৃষ্টিতে। তারপর যখন আরও পরবর্তী যুগে সেইসব সৃষ্টির মূল্যায়ন হয়, তখন ধরা পড়ে একটা যুগ, যা পরের যুগকে কতখানি দিয়েছে বা দিতে পেরেছে। ইতিহাসকে যদি আমরা স্বীকৃতি দিতে চাই তাহলে আমাদের সাংগীতিক অনুশীলনকে একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে চালিত রাখতে হবে, নইলে যেটা ঘটবে সেটা হবে বিনষ্টির পথ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাঙলায় রাগসংগীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়, এবং এই চেষ্টার মাধ্যম ছিল বাঙলার কাব্যসংগীত। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের যে ধারা প্রচলিত হয়ে এসেছিল তাকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধরনের লৌকিক রচনা করলেন নিধুবাবু, রাধামোহন সেন, কালী মীর্জা প্রভৃতি। এইসব গান খুব ছোটো আকারের, কিন্তু কাব্যরসে সমৃদ্ধ। এদের রূপ দেওয়া হতে লাগল টপ্পায় এবং খেয়াল আঙ্গিকে।

বেশ বুঝতে পারা যায়, মোগল যুগ থেকেই বাঙলার গায়কেরা খেয়াল বা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য রীতি-প্রকৃতির অনুশীলন করে এসেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এটাও বেশ বুঝতে পারা যায় যে, বাঙলা গানের সম্পর্কে তাঁরা ভিন্নভাবে চিন্তা করে এসেছিলেন, যাতে তার একটা স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

এই যে চিন্তা—এটাই হচ্ছে ওরিজিনালিটির লক্ষণ। তাঁরা ইচ্ছে করলে বাঙলা গানে একটা পানজাবি টপ্পার সুর হুবহু আরোপ করতে পারতেন ; কিন্তু সেটা তাঁরা করেন নি ; তার কারণ, একটা ভাষায় একটা রাগপ্রকৃতি যেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, অন্য ভাষায় তেমনটি হয় না। এই চিন্তার ফলে বাঙলার টপ্পা হয়ে উঠল একটা বিশেষ ধারা, যার গায়কি বিস্তার সবই বাঙলার সেনটিমেনটকে সন্তর্পণে এবং সাবধানে রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছে। এমনি আরও নানান রীতি বাঙলা গানে ফুটে উঠতে লাগল বিভিন্ন গীতিনাট্যে, কবি-গানে, পাঁচালি প্রভৃতি নানান পর্যায়ের শিল্পকলায়। যে 'থেউড়'-শ্রোতা গানকে আমরা খুব গালমন্দ করে এসেছি, অনুশীলন করে দেখলে দেখা যাবে তারও অনেক সৃষ্টিই রসসমৃদ্ধ এবং রসোত্তীর্ণ। আর যাই হোক না কেন, তা ছিল সর্বতোভাবে গানে, নিছক কাব্যের একটা সুরে রূপায়ন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে দেখা গেল, বাঙলা গানে বৈচিত্র্য আরও অনেকভাবে ফুটে উঠেছে ; এমনকি, যেসব গানের গঠনটা লোকসংগীতের সেখানেও রাগ-সংগীতের ছোঁয়া লেগেছে চমৎকারভাবে। এই শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলার সংগীত-কলায় হিন্দুস্থানি সংগীত কায়েমি হয়ে বসল। এর সূত্রপাত নবাব ওয়াজিদ আলী শা-র আগমনের পর থেকে। এই সময় বহু ওস্তাদ উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে কলকাতায় আসতেন স্বীকৃতিলাভের জন্য, কারণ কলকাতা ছিল ইংরেজদের রাজধানী ; সুতরাং সেখানকার স্বীকৃতির চেয়ে বড়ো স্বীকৃতি আর কোথাও পাওয়া যেত না। সেই স্বীকৃতি তাঁরা লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের উপরি আর-একটা লাভ হয়েছিল—সেটা বহু বাঙালি শিষ্যের গুরু-মর্যাদার স্বীকৃতি। এই সময় থেকেই বাঙালি গায়িয়রা বড়ো-বড়ো ঘরানার অংশীদার হতে সচেষ্ট হলেন এবং তাঁদের মনোযোগটা সম্পূর্ণভাবে হিন্দি গানের অনুশীলনে যত্নবান হতে লাগল। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বহু বাঙলা রাগধর্মী কাব্য-সংগীত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য তখনও বাঙালি ওস্তাদেরা বাঙলা গান যে না গাইতেন তা নয়, কিন্তু বাঙলা গানকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সেই উৎসাহে ভাটা পড়তে লাগল। তথাপি বাঙলা গানের একটা চর্চা ছিল, অনেকের নানান ধরনের বাঙলা রাগসংগীতের পুঁজিও কম ছিল না। এইটা চলে এল বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত। এই সময় পর্যন্ত কিন্তু বাঙলার পূর্বতন সৃষ্টিকে একটা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে ধরে রাখবার চিন্তা দেখা দিল না। গাইয়েরা হিন্দুস্থানি সংগীতের আভিজাত্যে এতটা আকৃষ্ট এবং ব্যস্ত হয়েছিলেন যে বাঙলা গান তাঁদের কাছে একটা স্বতন্ত্র আর্ট বলে পরিগণিত হয় নি। আমাদের সাংগীতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি ঘটেছে এইখানেই—যার ফলে আমাদের একটা ঐতিহ্যই বিস্মৃতির কবলে পড়ে সংগীতসমাজ থেকে তিরোহিত হতে লাগল। অথচ যদি এইসব গান একটা শ্রেণী হিসাবে চলিত থাকত, আজকে আমরা সগর্বে একটা বিরাট ঐতিহ্যের দাবি করতে পারতুম। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, পরবর্তী যুগে আমরা একেবারেই হিন্দুস্থানি সংগীতের কাছে সব স্বকীয়তা বিসর্জন দিলুম, এমনকি সংগীতের দিক থেকে আমাদের অক্ষয়পরিচয়ও আরম্ভ হল হিন্দুস্থানি সংগীতের মাধ্যমে, যেটা এখনো চলেছে এবং উৎসাহস্বরূপ বাইরের ডিগ্রী ডিপ্লোমা অর্জন করে আমরা অত্যন্ত বর্ধিত বোধ করছি।

এই শতাব্দীর পূর্বভাগে যখন আমরা গান শিখেছি, তখনও বাঙলা গানের মাধ্যমেই রাগের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতির রচয়িতাদের রাগ-ধর্মী সংগীতশিক্ষা থেকে আমাদের রাগ-সম্বন্ধে পরিচয়ের শুরু। এতে যে আমরা কতখানি লাভবান হয়েছি তা আজ উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু এই ধারা ক্রমেই পরিত্যক্ত হতে লাগল। ভাতখণ্ডে সংগীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উক্ত কাজ করেছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানি সংগীতের ধারাকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন। বাঙালি ছেলেরা তিরিশের দশক থেকে ওই ধারায় ব্যাপকভাবে শিক্ষা করতে অগ্রসর হয়। তারা চমৎকারভাবে নানা রাগের লক্ষণগত শিখত এবং মনে করত অন্য গানে রাগ সম্বন্ধে পরিচয়লাভের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু লক্ষণগত কেবল লক্ষণ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান প্রদান করতে পারে, তার সঙ্গে কাব্যের উৎকর্ষ, সৌন্দর্য এবং রস—এইগুলির পরিচয় দিতে পারে না। হিন্দি গানে অবশ্য এইসব গুণ যে বর্তমান নেই তা নয়, কিন্তু পরভাষায় সংগীত আয়ত্ত করবার সময় সে বস্তুগুলি স্বতঃপ্রণো-দিতভাবে শিক্ষার্থীর চিত্তকে আকৃষ্ট করে নি। পরন্তু, তান-বিস্তার-সর্গম-ই তাদের সংগীতশিক্ষায় প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, বাঙলা-রাগ-সংগীতের চর্চা যেটুকু ছিল তাও রক্ষা করা সম্ভব হল না।

এই সময় গ্রামোফোন কোম্পানি এবং অন্যান্য রেকর্ড-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ছিল সমধিক। তাঁরা বাণিজ্যিক রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং জনপ্রিয়তাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময় অনেক গীতকার এবং সুরকার খ্যাতি-লাভ করেছেন ; কিন্তু বাণিজ্যিক প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে তাঁরা নানারকম রচনায় কাছাকাছিও আসতে পারেন নি—যা পুরাতন বাঙলার টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, আড়খেমটা, দাদরায় রচিত গানগুলিতে দেখা গেছে। তাঁদের একটা আদর্শ ছিল, এঁদের তা ছিল না, জনপ্রিয়তাই ছিল এঁদের প্রধান কাম্যবস্তু। এঁরাও হিন্দুস্থানি পদ্ধতি থেকেই নানা বৈচিত্র্য আহরণ করেছিলেন, কিন্তু ধারকরা হিন্দি চালের গান বহু ক্ষেত্রেই ন্যবারিতে পর্যবসিত হয়েছে। বহু শিল্পী এবং রচয়িতার প্রতিভাকে আমরা অবশ্যই স্বীকৃতি প্রদান করি, কিন্তু তাঁরা একটা আকাডেমিক স্তরে পৌঁছোতে পেরেছেন কি? অতুলপ্রসাদ সেনও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক এবং তৃতীয় দশকের সূত্রপাত পর্যন্ত গান রচনা করেছেন,—কিন্তু তিনি একজন প্রধান কমপোজার-এর স্বীকৃতি লাভ করেছেন তাঁর ওরিজিনালিটির গুণে, তাঁর চিন্তার সমৃদ্ধিতে—যেগুলি ছিল তাঁর জন্মেরও পূর্বের সংগীত-ভ্রষ্টাদের মধ্যে—তাঁরা বাঙলা গান সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, তাকে রক্ষা করে-ছিলেন একটা বিশিষ্ট আর্ট হিসাবে।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে আকাশবাণীর কল-কাতার কেন্দ্র একপ্রকার গীতরীতির প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন, যার আখ্যা 'রাগপ্রধান'। এখনও এটি প্রায় অপাঙক্তেয় হয়েও চালু আছে। এদের আইডিয়া ছিল কাব্যপ্রধান গানে রাগ-সংগীতের স্পর্শে একটা নতুন রাগধর্মী কাব্যসংগীত সৃষ্টি করা। কিন্তু এটি সাফল্যলাভ করে নি। তার কারণ, যাঁরা এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা বাঙলায় কী ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে তার খবর রাখেন নি এবং হিন্দুস্থানি গানে অভিজ্ঞতার দরুন যেটা সৃষ্টি করলেন সেটা হিন্দি গানের নকল হয়ে দাঁড়িয়েছে—এমনকি ভাষা এবং কাব্যবন্ধ পর্যন্ত। দু-হাত-ফেরতা বস্তু যে স্বীকৃতির দাবি করতে পারে, আজকের রাগপ্রধান তার চেয়ে বেশি কিছু দাবি করতে পারে নি। এই পরি-কল্পনার মূখ্য প্রবর্তকদের উচিত ছিল সেইসব শিল্পীদের খোঁজ করা যাঁরা পুরাতন বাঙলা গানে পারদর্শী। যদি তাঁরা সেটা করতেন তাহলে একটা আর্টের সঙ্গে তখকালীন বাঙলার শিল্পীদের পরিচয় ঘটত এবং তখনই তাঁরা বাঙলা টপ্পা বা বাঙলা রাগসংগীত আখ্যায় একটি বিভাগ খুলতে পারতেন। কিন্তু, সেটি তাঁরা করলেন না, অথচ একটা নতুন গীতকলার সৃষ্টিতে উদ্যোগী হলেন। এঁরা নিজেরাও যে বাঙলা গানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন তা নয়, তাঁরাও প্রধানত হিন্দি গানকেই একমাত্র অব-লম্বন বলে গণ্য করতেন। একটা 'ক্রিয়ে-শন' এতটা সহজ নয় যে রাগপ্রধান বললেই সেটা একটা উৎকৃষ্ট আর্টে পরিণত হবে। আসলে কোনো স্বতন্ত্র দেশই তার নিজের ভাষায় অন্যদেশের সংগীতকে এক আবেদনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না ; তাকে তার স্বকীয়তা দিয়ে একটা নিজস্ব আর্টের পথ খুঁজে দেখতেই হবে। যথার্থ প্রতিভার হাতে পড়লে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবার একটা নতুন সৃষ্টির পথ খুঁজে পেত, কিন্তু সেই প্রতিভার সন্ধান আজও আমাদের করতে হচ্ছে।

এর মধ্যে কয়েক বছর আগে বাঙলা খেয়াল নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়ে গেছে। এই বাঙলা খেয়ালের নমুনা অনেক স্বরলিপিগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গানে 'বাঙলা খেয়াল' আখ্যায় যা প্রকট হয়েছে তা পুরোপুরি হিন্দি খেয়ালের বাঙলা সংস্করণ, এবং ভাষার অপটুতাও অতিশয় নৈরাশ্য-জনক। এইরকম নকল করবার প্রবৃত্তি থেকে কোনো বিশিষ্ট শিল্পের অভ্যুদয় ঘটতে পারে না। যদি এরকম গানই গাইতে হয় তাহলে ওরিজিনাল হিন্দি খেয়াল গাওয়াটাই প্রার্থনীয়, কারণ সেটাই যথার্থ বস্তু। আসলে রাগ-প্রধানই হোক আর খেয়ালই হোক, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমন একটি সৃষ্টি সম্ভব হবে যা বাঙলার সংগীতে একটা ক্লাস, একটা নতুন রচনা।

সেটির সম্ভাবনা দিন দিনই দূরূহ হয়ে উঠছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা সারেগামা শেখবার সঙ্গে-সঙ্গেই হিন্দি গান শেখে এবং সেসব গানের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে। তারা যদি আমা-দের শিক্ষারীতি অনুসারে বাঙলা রাগ-সংগীতের সঙ্গেও পরিচিত হত, তাহলে বুঝতে পারত, দুটো ধারায় তফাতটা কোনখানে। পুরাতন বাঙলার রাগ-সংগীতে বিস্তারটা একটা অসামান্য কারুকার্য, যা কাব্যকে যেমন তুলে ধরে তেমনি প্রকাশ করে রাগসংগীতের সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পর্যায়ের গানগুলিতে রাগসংগীত যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কি হিন্দি গানে পাওয়া সম্ভব? অতএব যেখানে নিজেদের প্রাচীন গীতকলা, তার ঐতিহ্য, তার চিন্তা এবং আদর্শ সমা-দৃত হয় নি সেখানে কী করে নতুন স্টাইল প্রবর্তন করা সম্ভব? আগে কী ঘটেছে, কতটা ঘটেছে এবং কী আদর্শে ঘটেছে—সেটা জানতে হবে, তার পরে নতুন সৃষ্টির কথা। শিল্পীদের বাঙলা গানে প্রবেশ করতে হবে, দুই শতাব্দীর সংগীতকে আয়ত্ত করতে হবে, তারপরে নতুন সৃষ্টির পরিকল্পনা নিজের প্রতি-ভায় সহজেই রূপধারণ করতে পারবে। তখন দেখা যাবে, আমাদের ঐতিহ্যই একটা নতুন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে এবং পুরাতন ধারায় যা চিরন্তন তার কিছুটা নতুন শিল্পে সহজে স্বাভা-বিকভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া যথার্থ সৃষ্টির আর কোনো পথ নেই, থাকতেও পারে না।

চিন্ময় লাহিড়ী

সতেরোই অগস্ট চিন্ময় লাহিড়ী প্রয়াত হলেন। ভারতীয় রাগসংগীতে এঁকে তিনি বাঙলার প্রতিনিধিস্বরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না। সর্বভারতীয় আসরগুলিতে তাঁর অভাব বিশেষরূপে

অনুভূত হবে। শুধু উত্তম গায়কই তিনি ছিলেন না, সুশিক্ষকও ছিলেন। বর্তমানে বহু প্রখ্যাত গায়কগায়িকা তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। অল্প-বয়সে তিনি লখনউ শহরে থাকতেন। সেখানে ম্যারিস কলেজে তিনি দীর্ঘদিন সংগীতশিক্ষার পর 'সংগীতবিশারদ' উপাধি লাভ করেন। তিনি যে সময়ে ম্যারিস কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং তাঁকে উপাধি অর্জনের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। উত্তর-প্রদেশে থাকবার সময় তিনি বহুপ্রকার সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং তাঁর গানে সেগুলিরও সুদক্ষ পরিচয় পাওয়া যেত। অল্প বয়স থেকেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং কলকাতা-সহ বাঙলার বহুস্থানে গান গেয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কলকাতায় আবার যখন বড়ো বড়ো সংগীত-সম্মেলন হতে লাগল, সেগুলিতে তাঁর স্থান পুরোভাগেই থাকত। যখন খেয়াল গাইতেন তখন তানের কাজে অসামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ পেত এবং সেসব কাজ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমস্ত আঙ্গিকেই তিনি নৈপুণ্যলাভ করেছিলেন। বহু ঠুংরী তিনি রচনা করেছিলেন এবং তাঁর একটি বিশেষ নামও ছিল, যেটি তিনি ভণিতা হিসাবে তাঁর গানে ব্যবহার করতেন। বাঙলায় রচিত গানে তিনি বড়ো খেয়াল রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি দু-একটি সম্মেলনেও সেসব চেষ্টার রূপায়ন দেখেছি। যে ধরনের বাঙলা গানকে আমরা রাগপ্রধান বলি, তাতেও তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর দেখেছি বহু অনুষ্ঠানে। বাঙলা সিনেমায় উচ্চাঙ্গসংগীত প্লেব্যাক করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি যে কেবল শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন তাই নয়, স্রষ্টা সংগীত-রচয়িতাও ছিলেন।

তাঁর মতো এমন অমায়িক ব্যক্তি খুবই বিরল। মুখে একটি মধুর হাসি সব সময় লেগে থাকত, এবং শিষ্টাচারে তিনি সকলকেই পরিতৃপ্ত করতেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় রবীন্দ্র-ভারতীর একটি অনুষ্ঠানে যেখানে বাঙলার প্রাচীন টপ্পা-গান তিনি মনোযোগসহকারে শুনেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর পুত্রবধূর সংগীতপারদর্শিতার উল্লেখ করেছিলেন, এবং তিনি যে অক্লান্তভাবে তাঁকে শিক্ষাদান করছেন সেকথা বলে একদিন তাঁর বাসগৃহে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়ে ওঠে নি। শুধু একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ বলেই নয়, একজন প্রকৃত সজ্জনের তিরোধানও আজ আমাদের অনেকের মনকেই বিষাদাচ্ছন্ন করে রাখবে। বাঙলার সংগীতজগতে আজ প্রকৃতই দুর্দিন এসেছে। একে একে শীর্ষস্থানীয় গায়কগণ বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু সেইসব স্থান পূর্ণ করবার মতো প্রতিভা কদাচিৎ দেখা যাচ্ছে—এই দুঃখটা প্রকাশ না করে পারছি না।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বিশ্বসাহিত্য

বিশ্বসাহিত্যের স্বরূপ কী, তাহা একপ্রকার বুঝিলাম। নিজের সাহিত্যের বিশেষ এক ভাগকে না-হয় বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদাও দিলাম। কিন্তু বিশ্বের মানুষ আমার সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা দিল কিনা, বুঝিব কী করিয়া। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থখানি একদা সারা বিশ্বে আদৃত হইয়াছিল, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক রচনা তখন যেন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গ হইয়া উঠিল। কিন্তু আজ শিক্ষিত বাঙালি যেমন আগ্রহসহকারে ইয়েটসের কবিতা পড়েন, তেমন আগ্রহ লইয়া কি শিক্ষিত ইংরাজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়েন? ইংল্যান্ডে যখন ছাত্র ছিলাম তখন লক্ষ করিয়াছি অকসফোর্ড, কেমব্রিজ, লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ছাত্রসমাজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। দুই-একটি অল্প বয়সের ছাত্র কবির নাম পর্যন্ত শোনেন নাই। অকসফোর্ড শহরের ব্ল্যাকওয়েলের দোকান হইতে একখণ্ড 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' ক্রয় করিয়া কলেজে ফিরিতেছি, এমন সময় এক দর্শনের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বইখানি তাঁহাকে দেখাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু যে ওই অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রদত্ত হিবার্ট লেকচারস, তাহা তিনি জানিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বের বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধেই বা আজ বিদেশে কতখানি আগ্রহ? যদি বল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যদি কোনো বঙ্গীয় ক্লাইভ ইংল্যান্ড জয় করিত আর বঙ্গভাষা ইংল্যান্ডের রাজভাষা হইত, আজ ইংরাজ টেমসের তীরে বসিয়া বৈষ্ণব-পদাবলী পড়িত, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব—ইংরাজ ফরাসির অধীন না হইয়া ফরাসি সাহিত্য পড়েন কেন, অথবা জারমানির অধীন না হইয়া জারমান সাহিত্য পড়েন কেন?

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই দেখি, বঙ্গভাষার দিকে শিক্ষিত ইংরাজের দৃষ্টি পড়িল। প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ এক ইংরাজের রচনা। প্রথম বাঙলা শব্দকোষও এক ইংরাজের কীর্তি। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের চর্চার ইতিহাসে প্রথম নাম এক ইংরাজের। বাঙলা ভাষার সৌন্দর্যও ইংরাজকে মুগ্ধ করিল। উইলিয়ম কেরি তাঁহার বাঙলা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিলেন, এই ভাষা প্রাচ্যের এক শ্রেষ্ঠ ভাষা। ফ্রানসিস হেনরি বেনেট স্কিন লিখিলেন,

Bengali unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas.

কিন্তু কয়জন ইংরাজ এই সুমধুর এবং সূক্ষ্মচিন্তাপ্রকাশক্ষম ভাষায় লিখিত সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া ইংরাজ পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করিলেন? ইংরাজ সংস্কৃত সাহিত্যের সংবাদ লইল, বাঙলা সাহিত্যের সংবাদ লইল কই? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যদি কয়েক জন বিদগ্ধ রসজ্ঞ ইংরাজ বাঙলা পদাবলী-সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধি করিয়া সুললিত ইংরাজিতে উহা ইংরাজ পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে বুঝি-বা ইংরাজি রোমানটিক কাব্যে এক নূতন সুর যুক্ত হইত। ইংরাজ আমাদের ভাষা শিখিল: সেই ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের ভাবজগতে প্রবেশ করিল না।

আমরাও ইংরাজি শিখিয়া ইংরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম, ইংরাজকে ডাকিয়া আমাদের হৃদয়ের সম্পদ দেখাইতে ব্যস্ত হইলাম না। বোধহয় আমরা ভাবিলাম, সিবিলিয়ান বা মিশনারি ইংরাজ আমাদের বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীর রহস্য কখনও বুঝিবে না। কাব্যের যে-রস আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে, সে-রস কোনো ইংরাজ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৯১ সালে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজ ছাত্রদের এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতেন। তাঁহার মুখে বঙ্কিমের একখানি উপন্যাসের কাহিনী শুনিয়া কতিপয় ইংরাজ ছাত্র ওই উপন্যাসের এক ইংরাজি সংস্করণের কথা তুলিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ওই উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য বঙ্কিমের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই অনুমতি দিতে বঙ্কিম কেন অসম্মত হইয়াছিলেন তাহা বঙ্কিমের মুখেই শুনিতে পারি:

"বিলাতে এখন প্রবলেম লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে।"

"ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে পারিবে না। শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না নয়, তাহারা গালাগালি দিবে। এই দেবী চৌধুরাণীর কথাই ধর। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? পলিগেমি বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। আমি এখন আমার বই ইংরাজিতে বাহির করিব না।"

বঙ্কিমের জীবৎকালে এক ইংরাজ মহিলা 'বিষবৃক্ষ'র এক ইংরাজি অনুবাদ লনডনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর-এক ইংরাজ-কৃত 'কপালকুণ্ডলা'র অনুবাদও বঙ্কিম দেখিয়া গিয়াছেন। কোনো কোনো মহলে 'কপালকুণ্ডলা'র প্রশংসাও হইয়াছিল। বঙ্কিমের মৃত্যুর চার বছর পর এই উপন্যাস ভারতীয়-ভাষাবিদ এক ইংরাজ পণ্ডিতকে বড়ো কম মুগ্ধ করে নাই। মনে হয়, 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি শুনিয়া একালের বাঙালি পাঠকও বলিবেন—ইহা অতি-প্রশংসা:

The novel throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboration, no undue working after effect; everywhere there are signs of the work of an artist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the *Marriage de Loti* there is nothing comparable to the *Kopalakundala* in the history of Western fiction, although the novelist himself, and many of his native admirers, see grounds for comparing the works of Bankim with those of Sir Walter Scott, probably because they are outwardly historical.

তবু জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আজ যেমন আমরা ডিকেনস বা থ্যাকারের উপন্যাস পড়ি, ইংরাজ পাঠক বঙ্কিমের কোনো উপন্যাস পড়েন কিনা।

এই শতাব্দীতে বাঙলা ভাষায় মহৎ উপন্যাস বড়ো কম লেখা হয় নাই। তাহার কয়েকখানির ইংরাজি অনুবাদও দেখিয়াছি। সে অনুবাদ ইংরাজি সাহিত্যে স্থান পায় নাই। কোনো ইংরাজি উপন্যাস আমরা ইংরাজ-কৃত বাঙলা অনুবাদে পড়িব না। ইংরাজ কেন আমাদের ইংরাজি অনুবাদে বাঙলা উপন্যাস পড়িবে? 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ কবি নিজে করিয়াছিলেন। কবিকৃত তাঁহার অন্য কাব্যগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ গীতাঞ্জলির অনুবাদের ন্যায় সুন্দর হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত না ইংরাজ বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া, বাঙলা ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া, বাঙালি জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইয়া বাঙলা উপন্যাস-কাব্যাদি অনুবাদ করেন, ততদিন আমাদের সাহিত্য ইংরাজ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি-নবিস, যাঁহারা একালের এজুরাজ, তাঁহারা নির্ভুল ইংরাজি লিখিতে পারেন, কেহ কেহ বা সুন্দর ইংরাজিও লিখিতে পারেন। কিন্তু যে

ইংরাজিতে ইংরাজ তাঁহার কাব্য-উপন্যাস পড়িয়া থাকেন, সে ইংরাজি তাঁহারা কেহই লিখিতে পারেন না। মুশকিল এই, আমাদের ইংরাজি যে একান্তভাবে আমাদের ইংরাজি, উহা যে ইংরাজের ইংরাজি কোনোক্রমেই হইতে পারে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

'পথের পাঁচালি'র ইংরাজি করিয়াছেন যৌথভাবে এক ইংরাজ ও এক বাঙালি। বাঙলা উপন্যাসখানির এই ইংরাজি সংস্করণটি পড়িয়া এক আইরিশ মহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যেন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া উহা পাঠ করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের এক অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমে একটি বিদেশী ভাষার আশ্রয়েই তাহা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক কারণে সেই ভাষা ইংরাজি ভাষা। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষান্তরের কাজ ইংরাজকেই করিতে হইবে। আমরা যেমন ইংরাজি সাহিত্যকে ঘরে আনিয়াছি, ইংরাজকেও তেমন বাঙলা সাহিত্যকে ঘরে তুলিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইল এই, ইংরাজের এমন ইচ্ছা হইবে কিনা। এ পর্যন্ত হয় নাই। যদি গত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বস্তু ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইত তাহা হইলে সেই বস্তু সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে স্থান পাইত। 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজির মধ্য দিয়াই ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, ইংরাজ পাঠক বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বড়ো উৎসাহী নন। দুই-একজন বিদ্যাচর্চার পথে বাঙলা ভাষার অনুশীলন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজ পাঠক আমাদের বাঙলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। পেঙ্গুইন গ্রন্থমালায় কত দেশের কত গ্রন্থ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার মধ্যে গীতা, ধম্মপদ দেখিতে পাই। কোনো বাঙলা গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

বাঙলা সাহিত্যকে কোনো বিদেশী একখানি কি দুইখানি গ্রন্থ পড়িয়া চিনিয়া লইতে পারিবে না। বাঙলা রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, বৈষ্ণব-পদাবলী, চৈতন্যচরিতামৃত, চণ্ডীকাব্য, শাক্ত-পদাবলী—অর্থাৎ আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বাঙলা সাহিত্যের অন্তঃস্থলে পৌঁছানো যাইবে না। রামায়ণ মহাভারত বাঙালির মৌলিক সৃষ্টি নহে। মনসামঙ্গলকে এক শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি না। তবু বলি, এই তিনখানি গ্রন্থের বস্তু সুন্দর ইংরাজি গদ্যে উপস্থিত না করিয়া বাঙলা সাহিত্যের সহিত ইংরাজ পাঠকসমাজের পরিচয় ঘটানো সম্ভব হইবে না। বৈষ্ণব-পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সামগ্রী। বাঙালি ইহাকে কীর্তনের মধ্য দিয়াই আস্বাদন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার কাব্যরূপ ইংরাজি ভাষায় উপস্থিত করা সহৃদয় বিদগ্ধ ইংরাজের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। চৈতন্যচরিতামৃতের ইংরাজি অনুবাদ নিপুণ হস্তে মহৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইংরাজ পাঠক ভারজিলে যাহা পাইয়াছেন চণ্ডীকাব্যে তাহা পাইবেন না। ট্যাসোর জেরুসালেম ডেলিভার্ড হইতেও ইহা ভিন্ন বস্তু। কিন্তু ইহারও এক বিশিষ্ট স্বাদ আছে। ইংরাজ সে স্বাদ উপভোগ করিবেন। ইহার সঙ্গে শাক্ত-পদাবলী যুক্ত করিলে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া বাঙলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করা যাইবে না।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের এক পূর্ণাঙ্গ সচিত্র ইতিহাস ইংরাজকে লিখিতে হইবে। বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালি ইংরাজিতে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার মূল্য স্বীকার করিয়াও বলি, ইংরাজ পাঠকের জন্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরাজকেই লিখিতে হইবে। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'দ্য বৈষ্ণব লিটারেচার অব মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল' পড়িয়া স্যর উইলিয়ম রোটেনস্টাইন বলিয়াছিলেন,

I hear the tinkle of the temple-bells along the ghats of Benares, the voices of women as they sing their sacred songs crossing the noble river in the boats at sunset and I sit once more with the austere Sanyasin friends I shall never see more.

কোনো ইংরাজ এই সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করিয়া ইহার ইতিহাস লিখিলে বারাণসীর মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ ক্যানটারবেরির গিরজার ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারে কিনা তাহা দেখিতে পারেন। একজন ইংরাজ আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস কিভাবে লিখিতে পারেন, দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থের জে বি অ্যানডারসন-লিখিত ভূমিকাটি পড়িয়া তাহার আভাস পাই। ভূমিকায় তিনি লিখিলেন,

It was a curious coincidence that just when monastic depravity, amid other causes, produced the Reformation of Martin Luther, there was born in Nadiya in Bengal the Vaishnava reformer Chaitanya.

ইংরাজ তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের সাহিত্যের মর্মে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের মধ্যযুগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমাদের আধুনিক সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যেই বা মধ্যযুগীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ কই? আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে মগ্ন হইয়া গত শতাব্দীর সাহিত্যকেও যেন উপেক্ষা করিতেছি। আহা, যদি বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম প্রমুখকে লইয়াই মাতিয়া থাক, তাহা হইলে আধুনিক হইবে কেমন করিয়া? ওই দেখো, ইউরোপীয় পাঠকসমাজ কেমন আধুনিক

সাহিত্য পড়িয়া একান্তভাবে আধুনিক হইয়া উঠিতেছে।

সাহিত্যের ডাক্তার হইবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন কি মধ্য যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে থিসিস লিখিতে হয়। কিন্তু যে সাহিত্য পাঠ করিয়া তুমি যথার্থ আত্মদর্শন করিবে, তাহা হইতেছে আধুনিক সাহিত্য।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় পাঠকসমাজের কোনো ধারণা নাই। আমরাও মনে করি, পাশ্চাত্ত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে এমন এক মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে যে তাহার কাছে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দী সর্বক্ষেত্রেই বড়ো ম্লান, বড়ো অকিঞ্চিৎকর। আমরা যাহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বেঙ্গলি রেনেসাঁস বলি, তাহা এক পরাধীন দেশের পক্ষে রেনেসাঁস হইতে পারে, ইউরোপীয়দের কাছে তাহার কোনো মাহাত্ম্য থাকিতে পারে না। এক ইংরাজি সাহিত্যই দেখিতেছি এই শতাব্দীতে এক বিরাট সাহিত্য। বস্তুত, দুই বিশিষ্ট যুগের সাহিত্য লইয়া ওই শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য—রোমানটিক যুগ এবং ভিকটোরীয় যুগ। একদিকে শেলী-কীটস-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ-বায়রনের মতো কবি ; ল্যাম-হ্যাজলিট-ডি কুইনসির মতো গদ্যলেখক ; স্কটের ন্যায় ঔপন্যাসিক ; অন্যদিকে শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে কত কবি, কত ঔপন্যাসিক, কত চিন্তাশীল গদ্যলেখক। আর আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন কই, হারবার্ট স্পেনসার কই, মিল বেনথাম কই?

ইহাও মনে রাখিতে হয়, ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের পিছনে রহিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেনট। আবার, অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেনটের পিছনে রহিয়াছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যের গৌরব স্বীকার করিয়াও বলিতে পারি—আমাদের এই শতাব্দীর সাহিত্যও বড়ো উপেক্ষণীয় বস্তু নহে। আর এই সাহিত্যের সম্পদ যদি ইংরাজিতে উপস্থিত করা যায়, তাহা বিশ্বসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া আদৃত হইবে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

শিল্পী প্রকাশ কর্মকার

জন্ম ১৯৩৩ সালে, কলকাতায়।

১৯৫৩ সাল থেকে প্রতি বছরই কলকাতা, শান্তিনিকেতন, এলাহাবাদ, লখনউ, দিল্লী, বোমবাই প্রভৃতি শহরে শিল্পীর চিত্ররচনার প্রদর্শনী হয়েছে—কখনও এককভাবে, কখনও সহ-চিত্রকারদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে। ফ্রানস, হল্যানড, সুইজারল্যানড আর পশ্চিম জারমানিতেও তাঁর একক প্রদর্শনী হয়েছে একাধিকবার।

শিল্পীর চিত্ররচনা সংরক্ষিত হয়ে আছে নয়াদিল্লির মডারণ আর্ট গ্যালারি আর ললিতকলা অকাদেমিতে ; কলকাতার অকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ ; এলাহাবাদ, লখনউ আর হায়দরাবাদের মিউজিয়মে, এবং সারা বিশ্বে বহু চিত্ররসিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে।